মোরা বড় হতে চাই
আহসান হাবীব ইমরোজ

উৎসর্গ
ইসলামী
শিক্ষা আন্দোলনের
অগ্রদূত
শহীদ আব্দুল মালেক
এবং
তাঁর সাথী অধ্যাপক আ.ন.ম. জাহের
অধ্যাপক আবু জিহাদ সহ
সকল দীপ্ত
অনুসারীদের
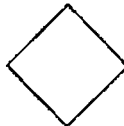
ইক্বরা (পড়)! মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টা তার **সর্বশ্রেষ্ঠ** ফেরেশতার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বোত্তম মানুষের কাছে **সর্বপ্রথম এই শব্দটিই** নাজিল করেন এবং এভাবেই শুরু হয় মহানবীর (স.) মহান শিক্ষা তথা আত্মগঠনের আন্দোলন। এরপর এই পৃথিবীতে শুরু হয় মানব সভ্যতার এক প্রোজ্জ্বল পরিক্রমা। ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইলের ভাষায়-**"মুহাম্মদ স. এর আবির্ভাব জগতের অবস্থা ও চিন্তাস্রোতে এক অভিনব পরিবর্তন সংঘটিত করে। যেন একটি স্ফুলিঙ্গ তমসাচ্ছন্ন বালুকা স্তূপে নিপাতিত হল। কিন্তু এই বালুকারাশি বিস্ফোরক বারুদে পরিণত হয়ে দিল্লি হতে গ্রানাডা পর্যন্ত আকাশমন্ডল প্রদীপ্ত করল।"**

মহানবী জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন- **"জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর এবং নারীর জন্য ফরজ।"** এর সময়সীমা বলেছেন- **"তোমরা দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর।"** এর বিস্তৃতি বলতে গিয়ে বলেছেন- "প্রয়োজনে চীন দেশে যাও।" রাসূলের এই মহান আন্দোলন সাহাবী থেকে তাবেয়ী এবং তাবেতাবেয়ী পর্যন্ত প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী মহান পুরুষদের জীবনে আমরা যে চিত্র দেখতে পাই তার মাত্র দু একটি উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

আল কিন্দী একাধারে বারোটি স্বতন্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরও ছয়টি ভাষাতে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং প্রায় ২৬৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। আল রাযী প্রায় ২০০টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার আল জুদারী ওয়াল্-হাসাবাহ্ নামক পুস্তকটি শুধু ইংরেজী ভাষাতেই চল্লিশবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। জ্ঞানার্জনে তার আগ্রহ তার বিনীত বক্তব্য হতেই বুঝা যায় ঃ **"জ্ঞান সাধনায় আমার অদম্য উৎসাহের ফলেই মাত্র এক বৎসরে আমি কুড়ি হাজার পৃষ্ঠার মৌলিক রচনা লিখেছি (প্রতিদিন প্রায় ষাট পৃষ্ঠা করে)। দিবা-রাত এমন কঠোর পরিশ্রম করেছি যে, শেষে আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলি। তবু আজও আমি অন্যকে দিয়ে বই পড়িয়ে শুনি কিংবা আমার রচনা লেখাই।"** আল-তাবারী জ্ঞানানুশীলনে তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ দৈনিক চল্লিশ পৃষ্ঠা করে মৌলিক রচনা লিখতেন (অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার পৃষ্ঠা)। আল ফারাবী দশটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং ৬টি স্বতন্ত্র বিষয়ে তার অগাধ পান্ডিত্য ছিল। প্রায় সত্তুরটি বিরাট নোটবুকে দর্শনশাস্ত্রের সারাংশ তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফারাবী এরিস্টটলের আত্মা সম্বন্ধীয় গ্রন্থটি একশতেরও বেশিবার এবং পদার্থবিদ্যা বিষয়টি চল্লিশবার পাঠ করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচ্যের সুধী-সমাজে এরিস্টটল মুয়াল্লিম

আউয়াল বা আদিগুরু ও ফারাবী মুয়াল্লিম সানী বা দ্বিতীয় গুরু হিসাবে পরিচিত। রাসূল (স.), সাহাবা আজমাঈন এবং তৎ-পরবর্তীদের সাধনা এবং তার ফলাফলের চিত্রকে পূর্ণরূপে তুলে ধরে প্রখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ জার্মান পন্ডিত ইমানুয়েল ডিউস বলেন- **"কুরআনের সাহায্যে আরবরা মহান আলেকজান্ডারের জগতের চাইতেও বৃহত্তর জগত, রোম সাম্রাজ্যের চাইতেও বৃহত্তর সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছিলেন। কুরআনের সাহায্যে একমাত্র তারাই রাজাধিপতি হয়ে এসে ছিলেন ইউরোপে, যেথায় ভিনিসী-য়রা এসেছিল ব্যাবসায়ী রূপে, ইহুদীরা এসেছিল পলাতক বা বন্দী রূপে।"** শুধু তাই নয়, রাসূলের (স.) মদিনা কেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্র তাঁর জীবদ্দশাতেই ৩০ থেকে ৩০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারে পরিণত হয়েছিল এবং প্রায় হাজার বৎসর পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে আজ আমরা চরম অধঃপতিত হয়েছি আর তাই আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, গুজরাট, কাশ্মীর, চেচনিয়া, বসনিয়া, মিন্দানাও প্রভৃতি দগদগে ঘা আমাদের কলিজা ছিঁড়ে ফেলছে। আর এর কারণ একটিই আমরা আত্মগঠন ও আত্মোন্নয়ন হতে অনেক অনেক দূরে। ঠিক এমনি একটি প্রেক্ষাপটেই- মোরা বড় হতে চাই বইটির অবতারণা।

যাদের জন্য এই বইটি লেখা তারা হচ্ছে নতুন সহস্রাব্দের আলী, খালিদ, তারেক, মুহাম্মদ ইবনে কাশেম এবং সুমাইয়া, জয়নব, আয়েশা ও ফতেমা এবং তাদের অভিধানে অসম্ভব বলতে খুব কম বিষয়ই আছে। যাদের চিঠিতে নীল-নদের শুকিয়ে যাওয়া পানি প্রবাহিত হতো, যাদের তাকবীরে পারস্যের অপ্রতিহত স্রোতস্বিনী পরাজিত হতো। যাদের ঘোড়ার খুরের দাপটে পৃথিবী প্রকম্পিত হতো তাদের জন্যই আজকের একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ।

আজকে যারা বিশ্বকে শাসন করছে সেই পাশ্চাত্য, তাদের হাতে কোন শক্তিশালী বা সুন্দর আদর্শ নেই। তবু কেন তারা বিশ্বকে শাসন করতে পারছে? কারণ তাদের আছে '**১. মানবীয় যোগ্যতা ২. কর্মের দক্ষতা এবং ৩. প্রযুক্তির শক্তি।**

আমাদের হাতে আছে বিশ্বের সব চাইতে সুন্দরতম আদর্শ আল-ইসলাম। তবু কেন আমরা পাশ্চাত্য দ্বারা নির্যাতিত, পর্যুদুস্ত, কিংবা কমপক্ষে তাদের মুখাপেক্ষী। এর কারণ- **১. আমাদের মানবীয় যোগ্যতা বিকশিত হয়নি। ২. কর্মের দক্ষতা সৃষ্টি হয়নি। ৩. প্রযুক্তির শক্তি নেই বললেই চলে।**

আজ প্রযুক্তির উন্নয়ন হচ্ছে রকেটের গতিতে। আর মানবীয় চরিত্র আর ভালোবাসার পতন হচ্ছে উল্কার গতিতে। আজ আকাশছোঁয়া অট্টালিকা হচ্ছে কিন্তু তাতে প্রশান্তি নেই। মঙ্গলগ্রহের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে কিন্তু নিজের স্বজনদের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। তাই যেমন প্রযুক্তির উন্নয়ন হচ্ছে ব্যাপকভাবে ঠিক

তেমনি পাল্লা দিয়ে হতাশা, অশান্তি আর হত্যা-আত্মহত্যার হারও বেড়ে চলেছে। এর কারণ একটিই বর্তমান পৃথিবীর শাসকরা বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রতি নজর দিলেও মন ও আত্মার উন্নয়নের দিকে তারা কোনই নজর দেয়নি। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের গুরু আমেরিকার কথাই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি- তারা বলে আমেরিকা নারী স্বাধীনতার দেশ অথচ সেখানেই প্রতি ৪৬ সেকেন্ডে একজন নারী ধর্ষিতা হয়। তারা বলে আমেরিকা সভ্যতার দেশ অথচ সেখানে প্রায় ৪৩% এর বেশি মানুষ জারজ সন্তান। তারা বলে আমেরিকা সোনার হরিণের দেশ অথচ সেখানেই সবচেয়ে বশি মানুষ আত্মহত্যা করে।

এ প্রেক্ষাপটে আমেরিকার এককালের খ্যাতিমান টিভি বিশ্লেষক জিমি সোয়াগার্ট আর্তনাদ করে বলেছেন- **"আমেরিকা, বিধাতা অবশ্যই তোমার বিচার করবেন (অর্থাৎ ধ্বংস করবেন); আর তিনি যদি তোমর বিচার না করেন, তাহলে নৈতিক অপরাধ এবং লালসা চরিতার্থ করার অপরাধ সডোম ও ঘোমরার জনপদের (আদ, সামুদ আর লুত সম্প্রদায়) অধিবাসীদের কেন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল; সেজন্য স্বয়ং বিধাতাকেই একদিন ক্ষমা চাইতে হবে।"**

বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামই পাশ্চাত্যের মোকাবেলায় একমাত্র সম্ভাবানাময় শক্তি। সুতরাং আমাদের জন্য একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ হলো ইসলামের শক্তিকে আরো সতেজ করার পাশাপাশি, বিশ্বমানের যোগ্যতা, দক্ষতা আর প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন। যাতে করে আর ধ্বংসোম্মুখ পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী নয় বরং আমরাই দিতে পারি বিশ্বের নেতৃত্ব। আর মানবতার কল্যাণ ও অনাবিল শান্তির জন্যই এটা দরকার। তাই এ বইয়ের পরতে পরতে শতশত সফল মনিষীদের উপমা দিয়ে নবীন ভাইবোনদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এ বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য। কারণ বিশ্ব আজ আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমরা মনে করি, আজকের প্রিয় নবীন ভাইবানরাই পারবেন বিশ্বের শাসক পাশ্চাত্যের মোকাবেলায় যোগ্যতা অর্জনের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে। হ্যাঁ আমাদের পারতেই হবে এবং তা এই ছাত্রজীবন হতেই শুরু করতে হবে। আর প্যারাডাইজ লস্টের কবি, মহাকবি মিল্টন বলেছেন ঃ

The childhood shows the man as morning shows the day.

আমরা যোগ্যতা অর্জনের যুদ্ধে শক্তিশালী পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করবো না, বরং তাকে চ্যালেঞ্জ করবো, তাকে হারিয়ে দিব, ইনশাআল্লাহ। আমরা আশা করছি যারাই এই স্বপ্নের ধারক এই বই হবে তাদের জন্য একটি গাইডবুক, একটি মাইলস্টোন, একটি লাইটহাউস। আমীন।

ক্যারিয়ার কি ও কেন এবং কিভাবে?

ক্যারিয়ার (Career) শব্দটি শুনতেই ভাল লাগে। আর চোখ বন্ধ করে স্বপ্নের জগতে বিভিন্ন ক্যারিয়ারের সিংহাসনে বসতে সে যে কি মজা! লিখে তা বুঝানো যাবে না। কিন্তু ক্যারিয়ার অর্জন বেশ কঠিন এবং অন্ত হীন এক সাধনার ফল। তার আগে চলো জেনে নেই ক্যারিয়ার অর্থ কি? হাতের কাছের Oxford Dictionary টি খুললেই আমরা পেয়ে যাবে। Career অর্থ দ্রুত গতি, বেগ, জীবনের ধারা বা অগ্রগতি, জীবিকা অর্জনের উপায় বা বৃত্তিকেই বুঝি। কিন্তু এখানে একটি কথা বলে নেয়া ভাল। জীবন বলতে যদি আমরা শুধু এই পার্থিব জীবন পৃথিবীকেই বুঝি, তবে ছোটবেলার মত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার হওয়ার বা অত্যধিক সাহসীর মত প্রেসিডেন্ট হওয়াকে জীবনের লক্ষ্য বা Aim in life বানানো যায়। কিন্তু জীবন যদি আখেরাতকে নিয়েই হয় এবং সে আখেরাত হয় চিরন্তন তবে তো জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত আখেরাতকেন্দ্রিক। তবে আখেরাত হবে দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতেই। সে হোক সফলতার জান্নাত অথবা ব্যর্থতার জাহান্নাম। আমরা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে পাই, আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন দুনিয়াতে খেলাফতের দায়িত্ব আর এটা সঠিকভাবে পালনের উপরই নির্ভর করছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। সুতরাং আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য বা Aim in life হবে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যারিস্টার হওয়া হবে সেই মূল লক্ষ্য অর্জনের উপলক্ষ বা Sub Aim। তবে আধুনিক জাহেলিয়াতের মুকাবেলার জন্য এই Sub Aim এর কোন বিকল্পই নেই। সুতরাং সঠিক নিয়তের মাধ্যমে বস্তুগত বা দুনিয়ার ক্যারিয়ার অর্জনও হতে পারে দ্বীন প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি। অর্থাৎ আমাদের হতে তবে ইঞ্জিনিয়ার খুররম মুরাদ ও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার-এর মত ইঞ্জিনিয়ার, মাহাথির মোহাম্মদ-এর মত ডাক্তার। হাসান আল বান্না, সাইয়েদ কুতুব আর অধ্যাপক বুরহান উদ্দিন রব্বানীর মত শিক্ষাবিদ। আব্দুল কাদের কুতুব আর অধ্যাপক বুরহান উদ্দিন রব্বানীর মত শিক্ষাবিদ। আব্দুল কাদের আওদা আর ডঃ হাসান তুরাবীর মত আইনবিদ। মাওলানা মওদুদী, ইমাম খোমেনীর মত ধর্মতত্ত্ববিদ। আর এ প্রস্তুতি শুরু হোক আজ থেকেই। কারণ শেক্সপিয়ারের কথাটি মূল্যবান, **"I waste time and now time wastes me."** এমনকি ডিকেন্স বলেছিলেন, **'বড় হতে হলে সর্বপ্রথম সময়ের মূল্য**

দিতে হবে।' আর সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের পড়া সেই সুন্দর কথাটি তো কখনও ভুলব না, Time and tide wait for none.

তবে ক্যারিয়ার অর্জনে একটি সুস্পষ্ট ও সুউচ্চ টার্গেট মানুষের সাধনা ও গতিকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। মুলতঃ এর অভাবেই আমরা নিজকে একটি সুন্দর পর্যায়ে উন্নীত করতে পারি না। যে সময় পারস্য সাম্রাজ্য ছিল বিশ্বব্যাপী এক অপরাজেয় শক্তি আর মুসলমানেরা ছিল হাতে গোনা সামান্য ক'জনার মিলিত ঈমানী শক্তি, ঠিক সেই সময়ই মুসলিম কর্তৃক পারস্যের পদানত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। এটি একদিকে যেমন কাফেরদের হাসাহাসির কারণ হয়েছিল অপরদিকে মুসলমানদের দীপ্ত সাহসী ও পরিশ্রমী করেছিল। আর এভাবেই পরবর্তীতে পারস্য বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল। এক কাঠুরিয়ার ছেলে সুদৃঢ় স্বপ্ন দেখেছিল সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে। সাধনার বলে তিনিই হয়েছিলন আব্রাহাম লিংকন। সুতরাং ক্যারিয়ার অর্জন বা মৌলিক সাফল্যের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও সুউচ্চ টার্গেট নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ববিজয়ী এক অনন্য বীর জুলিয়াস সিজার বলতেন, **'অধিকাংশ মানুষ বড় হতে পারে না-কারণ সে সাহস করে আকাশের মত সুউচ্চ টার্গেট ঠিক করে সে দিকে তাকাতে পারে না।'**

আর একটি কথা না বললেই নয় সেটি হচ্ছে-অদম্য পরিশ্রম।

Industry is the mother of good luck. ছোটবেলায় পড়া একথাটি কি আমরা নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি না? জাপান বিশ্বের একনম্বর শিল্পোন্নত দেশ কারণ জাতি হিসেবে তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, এমনকি প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার মানুষ অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে মারা যায়। মৃত্যুর কথা শুনে চমকে উঠলে? অথচ বাংলাদেশে প্রতিবছর হয়তাবা অলসতার কারণে কয়েক লক্ষ লোক মারা যায়। সুতরাং পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ বলেছেন, **'তিনি পরিশ্রমের ভিতর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।'** রাসূল (সা) স্বয়ং পঞ্চান্ন বছর বয়সে রমজান মাসে সত্তর মাইল পাহাড়ী রাস্তা হেঁটে বদর যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসন বল্ছেন, **'আমি সমস্ত জীবনে একদিনও কাজ করিনি।'** অথচ প্রত্যহ ষোল থেকে আঠার ঘন্টা তিনি কাজ করেছেন। কিন্তু যেহেতু গবেষণা ছিল তার কাছে খেল তামাশার মত সুতরাং তিনি পরিশ্রান্ত হননি। নোবেল বিজয়ী বার্নার্ড শ বলেছেন, **'আমি কাজ করি বাবা যেমন মদ খেতেন ঠিক**

তেমনিভাবে, এই আমার স্নায়ু রোগ।' আর তাই তিনি পরিশ্রান্ত হননি। সুতরাং কাজকে বানাতে হবে খেলার মত মজাদার বিষয়। আর লেখাপড়ার ক্ষেত্রে একই কথা। এ প্রসঙ্গে Flooper-এর বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ তিনি বলেছেন, I slept and dreamed that life was beauty. I wake and foun that life was duty."
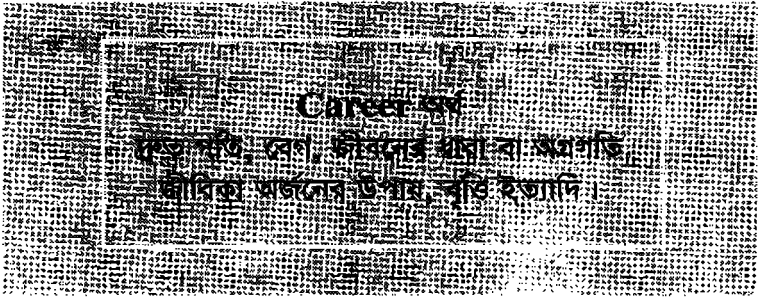
কে-সবচেয়ে বড়?
আল্লাহ্ তায়ালা
আর মাখলুকের ভিতর?
আকৃতিতে বড় - তিমিমাছ, হাতি।
দ্রুততায় বড় - সুইফট বার্ড আর লেপার্ড।
সৌন্দর্যে বড় - প্রজাপতি, ময়ুর, হরিণ।
শৃঙ্খলা, একতা আর পরিশ্রমে বড় - মৌমাছি, পিঁপড়া।
কিন্তু মানুষ হচ্ছে সকল মাখলুকের ভেতর সবচেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ; কিন্তু কেন? জ্ঞান, চরিত্র আর যোগ্যতায়। আর মানুষের ভেতর সবচেয়ে বড় মানুষ তারাই-যাদের জ্ঞান, চরিত্র আর যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি।
আমরা প্রথমতঃ ক্যারিয়ার গঠন বা মানবীয় উন্নতির কিছু মৌলিক ফর্মুলার কথা আলোচনা করবো- অতঃপর ক্যারিয়ারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। চলোই না তাহলে, আর দেরি না করে শুরু করা যাক আত্মোন্নয়নের পথ পরিক্রমা।

সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা

কোন পরিকল্পনা তা যতই সুন্দর হোক না কেন ততক্ষন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়না যতক্ষন না তার সাথে যোগ হবে সুদৃঢ় আকাংখা। নবুওয়ত পাওয়ার পরপরই যখন রাসূল (সা)-এর ওপর নেমে এলো বিপদের পর্বত; এমনকি কুরাইশ নেতৃবৃন্দ জোটবেঁধে দাঁড়িয়ে গেল বাধার পাহাড় হয়ে। এমনি সময়ে, সিংহপুরুষ আবু তালিবও ঘাবড়ে গিয়ে ভাতিজা মুহাম্মদ (সা) কে বললো, কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে একটি আপোসরফা করে চলার জন্যে। তখন, তখন কি হলো? আমাদের প্রিয় নবী কি ঘাবড়ে গেলেন? না, মোটেই না। বরং দ্বিগুণ তেজে বললেন, "ওরা আমার এক হাতে যদি চন্দ্র এবং আরেক হাতে সূর্যকেও এনে দেয় তবু আমার পথ থেকে আমি এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হবো না।" জীবনে এমন কঠিন অঙ্গীকার ছিল বলেই মক্কার সেই কিশোর রাখাল বালকটি বড় হয় সমগ্র জাহানের অধিপতি হয়েছিলেন। যার জীবন অধ্যয়ন করে নেপোলিয়নের মত বিশ্ববিখ্যাত সেনাপতিও আশ্চার্য হয়ে বলেছিলেন, **"মুহাম্মদের যুদ্ধবিজয়ের ঘটনাগুলি দেখলে মনে হয় তিনি কোন মানুষ নন; বরং**

স্বয়ং খোদা। কিন্তু আবার তাকে খোদাও বলা যায় না কারণ তিনি যুদ্ধে নিজে আহত হয়েছেন তার সৈন্যরা মারা গেছে; তাই কোন মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে তার এই অত্যাশ্চর্য বিজয়কে বিশ্লেষণ করা যায় না।" এত অল্প সময়ে রাসূল (সাঃ) এর অবিস্মরণীয় সাফল্যের পেছনে শুধুমাত্র আল্লাহর সাহায্যই নয় বরং তার সুদৃঢ় আকাংখা এবং সাধনাও মূল কার্যকারণ হিসাবে কাজ করেছে। আর তাই তো আমেরিকার সবচেয়ে সফল প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, **"যদি কেউ গভীরভাবে উকিল হওয়ার ইচ্ছা করে তবে অর্ধেক ওকালতি পড়া হয়ে যায়, আর বাকি অর্ধেকটা তাকে বই পড়ে শিখতে হয়"**। ঠিক তেমনি আটলান্টিকের ওপর দিয়ে সবার আগে উড়ে যাওয়া অ্যামেলিয়া আরহার্ট বলেছেন, **"আমি আটলান্টিকের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলাম কারণ আমি উড়তে ইচ্ছে করেছিলাম।"** ব্রিটেনের টাউনশেন্ড অফিসের এক ক্যাশিয়ার, কলম পিষতে পিষতে হঠাৎ ভাবলেন, হায়! এভাবেই কি জীবনটা শেষ হয়ে যাবে? যেই ভাবা সেই কাজ, চাকুরি ছেড়ে দিলেন তিনি। যাত্রা হলো শুরু। শেক্সপীয়রের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন নিজেকে এবং ভাবীকালে সত্যিই তিনি শেক্সপীয়রের সমকক্ষ, সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী জর্জ বার্নাডশ হয়েছিলেন। সুতরাং বলা যায়, সুদৃঢ় ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সফলতার পূর্বশর্ত। আল্লাহপাক কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, **"যারা সুদৃঢ় প্রত্যয়ী তারাই সফলকাম।"**

সাধনা আর সাধনা

শুধু সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা করে চুপটি করে সোফায় বসে থাকলেই সাফল্য আসবে? না একেবারে না, এমনকি একরত্তি আলপিনও একচুল পরিমাণ নড়বে না। তাহলে উপায়? হ্যাঁ, আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে চাইলে দরকার সাধনা আর সাধনা। যেমনটি রাসূল (সা) বিজয়ের জন্য সব ছেড়েছুড়ে পনের বছর শুধু ধ্যান করেছেন, তের বছর প্রচণ্ড ধৈর্য ধরে দাওয়াত দিয়েছেন, আর দশ বছর এমন কি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে গেছেন। ইমাম বুখারী (রহ) কুরআনের পর সবচেয়ে সেরা গ্রন্থ বুখারী শরীফ রচনা করতে গিয়ে, একটি হাদিস সংগ্রহে তিনশ' মাইল হেঁটেছেন। ঠিক তেমনি স্কটল্যান্ডের রবার্ট ব্রুস তার দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে শক্তিশালী বৃটেনের বিরুদ্ধে পাঁচবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিবারই পরাজিত হন। অতঃপর এক গুহায় আত্মগোপন অবস্থায় দেখতে পান একটি মাকড়সা জাল বুনতে গিয়ে পাঁচবার ব্যর্থ হয়ে

ছয়বারের বার সফল হয়। তিনি লজ্জিত হয়ে এই ক্ষুদে মাকড়সা থেকে শিক্ষা নিয়ে ষষ্ঠ বার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বৃটেনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। প্রায় এক হাজার নতুন বিষয়ের আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক এডিসনের মৃত্যুর পর নিউইয়র্ক পত্রিকায় লেখা হয় **"মানুষের ইতিহাসে এডিসনের মাথার দাম সবচেয়ে বেশি। কারণ এমন সৃজনশক্তি অন্য কারো মধ্যে দেখা যায়নি।"** অথচ ১৮৭৯ সালের ২১ অক্টোবর তার আবিষ্কৃত পৃথিবীর প্রথম বৈদ্যুতিক বাতিটি যখন জ্বলে উঠলো; তখন ক'জন জানতো যে বিগত দু'বছরে তিনি এটি নিয়ে প্রায় দশ হাজার বার ব্যর্থচেষ্টা করে আজ সফল হয়েছেন! সত্যি সাফল্যের পেছনে কি নিদারুণ সাধনা। বিটোফেন সম্ভবত সাধনায় সকল সুরকারকে ছাড়িয়ে যাবেন। তার স্বরলিপিতে এমন একটি দাঁড়ি নেই, যা অন্তত বারো বার কাটাকুটি করা হয়নি। গিবন তার আত্মজীবনী নয়বার লিখেছিলেন। তিনি শীতগ্রীষ্ম সবসময়ই ভোর ছয়টায় পড়ার ঘরে ঢুকতেন। এভাবে ত্রিশ বছরর চেষ্টায় বিশ্ববিখ্যাত 'দি ডিক্লাইন এন্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার' গ্রন্থটি লেখেন। বাটলার তার এ্যানালজি লিখেছেন বিশবার। আমরা মানুষের সংগ্রামী জীবনে দেখি সাধনার মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে সবাইকে চমকে দিয়ে কিভাবে অন্ধমানুষ মিল্টন বিশ্ববিখ্যাত কবি হলেন একজন বধির মানুষ বিটোফেন কিভাবে সঙ্গীত রচয়িতা হলেন। একজন অন্ধ, বোবা আর বধির মেয়ে হেলেন কিলার কিভাবে সাধনা করে চব্বিশ বছর বয়েসে তার কলেজে সর্বোচ্চ মার্ক নিয়ে বি, এ পাস করলেন এবং পরবর্তীতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করলেন। কিভাবে একজন কাঠুরিয়া ছেল আর মুদি দোকানদার বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন হলেন। এসব কিছুর পিছনে যাদুর মতই যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হচ্ছে সাধনা- নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। আর তাইতো বৈজ্ঞানিক এডিসন বলেছেন, **"প্রতিভা-একভাগ প্রেরণা আর নিরানব্বই ভাগ পরিশ্রম ও সাধনা।"** লংফেলো আরো বলেছেন, **"প্রতিভা মানে অপরিসীম পরিশ্রম"**। সবাইকে চমকে দিয়ে একটি কথা বলেছেন স্পেলার **"প্রতিভা বলে কিছু নেই। সাধনা করো- সিদ্ধিলাভ একদিন হবেই।"**

সময় - এখনই উপযুক্ত সময়

সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিবস, মাস আর কিছু বছরের সমষ্টি হচ্ছে আমাদের জীবন। যেমন কেউ যদি সত্তর বছর বাঁচে তবে তা ঘণ্টার হিসাবে হবে

৬,১৩,৬৩২ ঘণ্টা; সংখ্যাটা অনেক বড় মনে হয় তাই না? কিন্তু হিসাব কষলেই বুঝবা জীবনটা কত ছোট! যেমন শৈশবের অপরিপক্কতা ও বার্ধক্যের দুর্বরতার জন্যে যথাক্রমে পাঁচ ও দশ বছর হিসাব থেকে বাদ দিলে মোট বছর থাকে পঞ্চান্ন। এর ভিতর ঘুম ও বিশ্রামে যাবে প্রতিদিন কমপক্ষে আট ঘন্টা। দাঁতব্রাশ থেকে শুরু করে টয়লেট, ওযু, নামায, গোসল, খাওয়া, পত্রিকা পড়া, কাপড়পরা, যাতায়াত, গাড়ির জন্যে অপেক্ষা, যানজট, চা-নাস্তা, খেলাধুলা, টিভি দেখা, গল্পকরা ইত্যাদি দৈনন্দিন আনুষঙ্গিকতায় কমপক্ষে প্রতিদিন যায় ছয় ঘন্টা। সুতরাং মৌলিক কাজের সময় থাকলো প্রতিদিন মাত্র দশ ঘণ্টা। অর্থাৎ পঞ্চান্ন বছর মানে সারা জীবনে মাত্র ২,০০,৮৯০ কর্মঘণ্টা। তার ভিতর আবার প্রায় পঁচিশ বছর কেটে যায় লেখাপড়ায় অর্থাৎ প্রস্তুতিমূলক কাজে। অতঃপর মূলকাজের জন্যে থাকে ত্রিশবছরে মাত্র ১,০৯,৫৮০ কর্মঘণ্টা। দশ বছর বয়স থেকে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে টিভি দেখলে মোট সময় যাবে ২১,৯১৫ ঘণ্টা, যা জীবনের মোট কর্মসময়ের ৫ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং কর্মের তুলনায় জীবনের পরিধি খুবই কম। আর তাই সময় নষ্ট করা মানে জীবনকেই ধ্বংস করা। আর তাই আল্লাহপাক সময় (আছর) নামক সূরায় বলেন **"সময়ের কসম; নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত (যারা সময়ের মূল্যায়ন করে না)।"** চার্লস ডিকেন্স বলেন, **"বড় হতে হলে সর্বপ্রথম সময়ের মূল্য দিতে হবে।"** সুতরাং আমাদের প্রতিটি মুহূর্তকে অত্যন্ত হিসেব করে কাজে লাগাতে হবে। আর এ জন্যে চাই একটি পরিকল্পিত রুটিন, আর গোছালো জীবন।

কিন্তু তা কখন থেকে? অবশ্যই এখন থেকে। কেননা প্রবাদ আছে, **"সময়র এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়"**। আর জীবনে বড় কিছু করতে হলে তা শুরু করার এখনই উপযুক্ত সময়। কারণ, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সমাজ সংস্কারে হিলফুল-ফযুল গড়ে তুলেছিলেন মাত্র সতের বছর বয়সে। আলী (রাঃ) সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে রাসূলের সঙ্গী হয়েছিলেন মাত্র এগার বছর বয়সে। নেপোলিয়ন ইটালী জয় করেছিলেন মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে। আইনস্টাইন ষোল বছর বয়সেই আপেক্ষিত মতবাদ নিয়ে প্রথম চিন্তা করেন যা পরবর্তীতে ছাব্বিশ বছর বয়সে প্রমাণ করেন। ১৯৩৫ সালে, নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে দশম শ্রেণীর চৌদ্দ বছরের যে বালকটি তার বিশ/পঁচিশ মিনিটের ভাষণে সকল জাদরেল বক্তাকে মাত করে দিয়েছিলেন সাইত্রিশ বছর পর তিনিই হয়েছিলেন বাংলাদেশে প্রথম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। ১৯৩১ সনে সপ্তম শ্রেণীর যে

ছেলেটি 'বোম্বাই ক্রনিক্যাল' পত্রিকা আয়োজিত সারা ভারতবর্ষব্যাপী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম হন তিনিই **উত্তরকালে** শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন হয়েছিলেন। **১৯৪৮ সালের মাত্র ১৮ বছর বয়সে সেই ছেলেটি তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম কিশোর পত্রিকা মুকুল এর পাঠক নয় সম্পাদক হয়েছিলেন**। তিনি হন পরবর্তীতে ইউনেস্কোর সম্মানজনক আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরষ্কার পাওয়া এশিয়দের দু'জনের একজন ডঃ আব্দুল্লাহ আল মুতি। সুতরাং আজ থেকেই শুরু হোক বিজয়ের অভিযাত্রা। চলো কবি তালিম হোসেনের ভাষায় আমরাও গেয়ে উঠি

"আমরা জাতির শক্তি-সৈন্য, মুক্তবুদ্ধি বীর,
আমাদের তরে শূন্যে আসন জাতির কাণ্ডারীর।"

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

রাসূল (সা) তাঁর শত ব্যস্ততার ভিতরও প্রতিদিন কমপক্ষে ছয় থেকে আট ঘণ্টা আল্লাহর ইবাদাতে কাটাতেন। এমনকি বদর যুদ্ধের সেই কঠিন মুহূর্তে কাফেরদের তিন ভাগের এক ভাগ নিরস্ত্র প্রায় মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় বসে গেলেন। আর আল্লাহও দিলেন তাকে চূড়ান্ত বিজয়। নামাজরত অবস্থায় পায়ে বিদ্ধ তীর টেনে বের করার পরও টের পাননি যিনি, তিনিই হয়েছিলেন কাফিরদের ত্রাস শেরে খোদা হযরত আলী হায়দার। আর তাইতো খেলাফতের যুগে চীনের এক গোয়েন্দা চীনসম্রাটের কাছে মুসলমানদের ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করেছিল– **"এদের রাত কাটে জায়নামাজে কেঁদেকেটে, আর দিনের বেলার আকাশ অন্ধকার হয়ে যায় এদের ঘোড়ার খুরের দাপটে, উড়ন্ত ধুলায়; সুতরাং এদের কেউ পরাস্ত করতে পারবে না।"** ঠিক এমনি যুদ্ধের বিজয়ের মতোই আত্মগঠনের সাফল্যের জন্যেও দরকার আল্লাহর কাছে অবিরত প্রার্থনা। যেমন আল্লাহই শিখিয়েছেন দোয়া **"হে প্রভু আপনি আমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।"** আধুনিক বিজ্ঞানীরাও ধর্মের দিকে ঝুকে পড়েছেন। বিজ্ঞানীদের ভিতর সবচেয়ে বড় নোবেল পাওয়া বিজ্ঞানী অ্যালেঙ্গী কমরেখ পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচারিত 'রিডার্স ডাইজেস্ট, পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লেখেন, **"প্রার্থনা একজন মানুষকে সবচেয়ে বড় শক্তি দান করতে পারে। এই শক্তি কাল্পনিক শক্তি নয় মাধ্যাকর্ষণের মতোই তা অত্যন্ত বাস্তব। একজন ডাক্তার হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা হল– সমস্ত ওষুধ ও চিকিৎসা যেখানে ব্যর্থ সেখানে প্রার্থনার জোরে মানুষ নবজীবন লাভ করেছেন। রেডিয়ামের মতই**

আলো এবং শক্তি ছড়ায় প্রার্থনা। মানুষের শক্তি সীমিত, কিন্তু প্রার্থনার দ্বারা সে অসীম শক্তিকে ডাকতে পারে নিজের শক্তি বাড়াবার জন্যে। প্রার্থনা এমন একটি শক্তি যার দ্বারা মানুষ উপকার পায়ই।"

সুপ্রিয় মণিমুক্তা আর হিরকখণ্ডরা, এসো আমরা সবাই অসীম করুণাময় আল্লাহর কাছে হাত তুলি আর দোয়া করি তাঁরই ভাষায় আমাদের জন্যে তিনি বাধ্যতামূলক করেছেন প্রতিদিন যেটি পড়তে কমপক্ষে সতেরবার **"..... ওগো আমাদের প্রভু আমাদের সহজ, সরল আর সফলতার পথ দেখাও ....।"** ছোট্টমণি ভাই-বোনেরা, এবার এরই ধারাবাহিতায় তোমাদের নিয়ে কিছু মৌলিক আলোচনায় যেতে চাই। চলোই না দেখি বড় অনেক অ-নে-ক বড় হওয়ার জন্য আমাদের আর কি কি দরকার!

পড়ালেখা আর পড়ালেখা

আমরা আমাদের ছোট বেলায় শুনতাম পড়ালেখা করে যে গাড়িঘোড়ায় চড়ে সে। আর দুষ্টু ছেলেরা ফাঁকি দেয়ার জন্যে বলতো পড়ালেখা করে যে গাড়ি চাপা পড়ে সে। আজ বড় হয়ে দেখছি শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই গাড়ি চাপা পড়ে। আর শিক্ষিতরা গাড়ি কিনে যেসব গাড়িতে চড়ে ঠিক তেমনি লেখাপড়া না করেও আজকালকার মাস্তানরা নানাভাবে গাড়ি হাকায়। এতে কি আমরা হতাশ হবো? নাহ্ কক্ষনোই না। কারণ আমরা জানি মাস্তানরা গাড়ি চালালেও তারা মানুষের ভালবাসা পায় না, এমনি কি অনেক ক্ষেত্রে নিজের পিতামাতারও না। তবে একটা জিনিস তারা সবসময় বেশি পায়- সমাজের সকলের কাছ থেকেই পায়, সেটি হলো ঘৃণা আর ঘৃণা। কাজেই আমরা লেখাপড়া করবো শুধু গাড়িতে চড়ার জন্যেই নয়- বরং বড় অনেক বড় মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্যে। স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরাইলের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সা) এর কাছে সর্বপ্রথম এ আসমানী নির্দেশটি পাঠালেন, তোমরা জান সেই মহান গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি কি ছিলো? সেই পবিত্রতম বাণীটি ছিল- 'ইক্করা মানে 'পড়'। তোমরা কি জান? কেন আমাদের আশরাফুল মাখলুকাত- অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়? সে এক মজার কাহিনী, আদম (আ) কে সৃষ্টির পরপরই একটি চমৎকার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। একদিকে সকল ফেরেশতা অপর দিকে আদম (আ) একা। আল্লাহ ছিলেন প্রধান বিচারক। প্রতিযোগিতায় বিষয়বস্তু ছিল 'জ্ঞান'। আমাদের আদি পিতা আদম (আ) সে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বলেই আমরা আশরাফুল

মাখলুকাত খেতাব পেয়েছি। রাসূল (সা) জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, **'তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করো।'** এর আগে পরে কোন সময় জ্ঞান অর্জন থেকে বাদ দেয়া যায় কি? জ্ঞানের শক্তিতেই একদিন মুসলমানরা সারা পৃথিবীকে শাসন করেছে। ১২৫০ সালে স্পেনের টেলেডোতে আজকের সভ্য ইউরোপের শিক্ষক মুসলমানেরা প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র School of Oriental Studies স্থাপন করেন। কর্ডোভাতে পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানরা স্থাপন করেন। যেখানে সব সময় ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতো। যার ব্যাপারে যোশেফহেলের মন্তব্য হলো

Cordova shone like lighthouse on the darkness of Europe. আমি সেই সময়ের কথা বলছি যখন ইউরোপ খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরিটি ছিল রানী ইসাবেলার যাতে বইয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০১টি। অপরদিকে তৎকালনি ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী কায়রোতে মুসলমানদের পাঠাগারে জমা ছিল ১০ লক্ষ বই। ঠিক সেই সময় অসভ্য ইউরোপে মুসলমানদেরই আবিষ্কার পৃথিবী গোল বলার অপরাধে মিঃ ব্রুনোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, গ্যালিলিওকে বিজ্ঞানের প্রচারের জন্যে কারাগারে আটক করা হয় অবশেষে অন্ধ, বধির হয়ে তিনি সেখানেই মারা যান। কাগজ, ঘড়ি, বারুদ, মানচিত্র, ইউরোপ থেকে ভারতের রাস্তা এমনকি আমেরিকার আবিষ্কর্তা মুসলমানেরা। দুর্ভাগ্য- আজকে তারাই বিশ্বে সবচেয়ে পশ্চাদপদ জাতি। কারণ এক সময় পৃথিবীর শিক্ষক হলেও এখন তারাই সবচেয়ে কম পড়ালেখা করে। অথচ রাসূল (সা) বলেছেন- **জ্ঞান হচ্ছে মুসলমানদের হারানো সম্পদ।** সুতরাং বড় হতে হলে এ বিশ্বটাকে আবারো জয় করতে চাইলে অনেক অ-নে-ক বেশি পড়ালেখা করতে হবে। মুসলিম ছাড়াও বিশ্বে যারাই বড় হয়েছেন তারাই প্রচণ্ড পড়ালেখা করেই বড় হয়েছেন। যিনি দারিদ্রতার কারণে ঘড়ি বিক্রি করে দিয়ে দিনে আধপেট খেয়ে, সারাদিন লাইব্রেরীতে পড়ে থাকতেন আর পৃথিবীকে পরিমাপ করতেন। তিনিই পরবর্তীতে রূপকথাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে জগৎবিখ্যাত নেপোলিয়ান হয়েছিলেন। হেলেন কিলার ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ; কিন্তু চক্ষুষ্মান অনেক-অনেক লোকের চাইতেও তিনি অধিক সংখ্যক বই পড়েছেন। সাধারণের চাইতে কমপক্ষে একশ গুণ এবং নিজেই লিখেছেন প্রায় এগারোটি গ্রন্থ। আর নোবেল বিজয়ী বার্ণার্ডশ, দারিদ্রতার কারণে মাত্র পাঁচ বছর স্কুলে লেখাপড়া

করতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনিই ছিলেন বিশ্বে তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তিনি মাত্র সাত বছর বয়সে সেকশপিয়ার, বুনিয়ান, আলিফ লায়লা, বাইবেল প্রভৃতি অমর গ্রন্থ শেষ করেন আর বারো বছর বয়সেই ডিকেন্স, শেলরি বইগুলি হজম করে ফেলেন তিনি। আমরাও যদি বড় হতে চাই পড়ালেখার কোন বিকল্প নেই। আমাদের উপমহাদেশেও যে সকল ব্যক্তিত্বকে মানুষ সর্বদা স্মরণ করে তারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন মহাজ্ঞানী আর সুউচ্চ ক্যারিয়ার সমৃদ্ধ। আল্লামা ডঃ ইকবাল মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ব্যারিস্টার ও ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে ব্যারিস্টার হন। ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধী, প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ব্যারিস্টার ছিলেন। আমাদের নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্, শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী এরাও তাদের সময়ের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ব্যারিস্টার ছিলেন। তাদের কথা চিন্তা করে এসো, গোলাপকলিরা আমরা শ্লোগান দেই **'বিশ্বটাকে গড়তে হলে বার আগে নিজেকে গড়ো।'** একজন মহান ব্যক্তির মহান কথা। তিনি যখন অসহায়ভাবে রাশিয়ার এক রেলস্টেশনে মারা যান তখন তার ওভারকোটের পকেটে পাওয়া যায় মূল্যবান এক বই 'দ্যা সেইং অপ প্রোফেট মোহাম্মদ'। সেই নোবেল বিজয়ী লিও টলস্টয়কে বলা হয়েছিল জাতীয় উন্নয়নের জন্যে আপনি যুব সমাজের প্রতি কিছু বলুন। তিনি বলেছিলেন আমার তিনটি পরামর্শ আছে

বিজ্ঞানী
আইনস্টাইন

১। পড়

২। পড়

৩। আর পড়।

এটি যেন মহান আল্লাহর সেই প্রথম বাণী 'পড় তোমার সে প্রভুর নামে' এরই প্রতিফলন।

অনেক সময় আমাদের মনে হয় আল্লাহ বোধহয় কিছু মানুষকে জন্মগতভাবেই প্রতিভা দিয়েছেন সুতরাং আমাদের চেষ্টা করলেও খুব একটা লাভ হবে না। এতে করে নিজেদের ভিতর অজান্তেই একধরনের নিষ্ক্রিয়তা জেঁকে বসে, আত্মোন্নয়নের গতি হয়ে যায় শ্লথ। এই তো সেদিন একটি বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা অহরহতে দেখলাম কিছু নিউরোলজিস্ট গবেষণা করে বলেছেন, বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সংরক্ষিত মগজ সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা, অনেকটা বড়। এটাকে সত্য ধরে নিয়েও বলা যায়, এটি হচ্ছে একটি আশ্চর্যজনক ব্যতিক্রম ইংরেজিতে যাকে বলা হয় মিরাকল আর ইসলামের দৃষ্টিতে বলা হয় মোজেজা। আল্লাহ্ তার কুদরতি ব্যবস্থাপনায় মানুষের শিক্ষার জন্যই কদাচিৎ এমনটি করে থাকেন। আমার ধারণা কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতিভাই আল্লাহ্ প্রদত্তভাবে সমান। অতঃপর সাধনার কমবেশির কারণে প্রতিভার স্ফুরণের ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। আমরা অনেকেই প্রায়ই বলি "আমার কোন যোগ্যতা নেই "। আমার মনে হয় ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের এটা বলার কোন সুযোগ নেই। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন '.... **নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা (মানুষকে) প্রেরণ করব।**' খলিফা মানে হচ্ছে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি কিন্তু শুধুমাত্র নিজের পাড়া, গ্রাম, থানা, জেলা বা দেশের জন্যে নয় বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্যে। সুতরাং প্রিয় বন্ধুরা বুঝতেই পারছো, প্রতিটি মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জন্মগতভাবেই আল্লাহ্পাক কত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন। সুতরাং এটি কি ভাবা যায় এত বড় বিশাল দায়িত্ব

আল্লাহ্ যাদের দিলেন তাদের তিনি যোগ্যতা কম দিয়েছেন? অথবা তিনি জানতেনই না যে এ মানুষটার যোগ্যতা কম। (নাউজুবিল্লাহ!) আল্লাহর ওপর এত বড় অভিযোগ কেউ কি করতে পারে/ সুতরাং যারা বলেন **"..... আমার কোন যোগ্যতা নেই ......"**। অথবা **'...... আমার যোগ্যতা কম ....."**। তারা প্রকারান্তরে আল্লাহকেই অভিযুক্ত করেন, কেননা তিনিই তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বজ্ঞ হিসেবেই এই বিশাল দায়িত্ব আমাদের দান করেছেন। আমাদের কারো যোগ্যতা তুনামূলকভাবে অন্যদের চাইতে কম মনে হলে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, আমি এখনো আমার যোগ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারিনি'। জন. ডি. রকফেলার প্রথম জীবনে ঘণ্টায় মাত্র চার সেন্টের (মার্কিন চার পয়সা) বিনিময়ে আলুক্ষেতে কাঠফাটা রোদের ভিতর লোহার কোদাল দিয়ে কাজ করেছেন। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি পরিণত হয়েছিলেন সেই সময়কার আমেরিকার সবচেয়ে সেরা ধনীতে। প্রায় ষাট বৎসর আগে মৃত্যুর পূর্বে তিনি দু'বিলিয়ন ডলার (প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা) এর মালিক হয়েছিলেন। যার সম্পদ এখনও বেড়ে বেড়ে চলেছে প্রতি মিনিটে প্রায় একশ ডলার অর্থাৎ দিনে প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা করে। যদিও তিনি মুসলিম ছিলেন না তবুও তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করতেন, নাচতেন না, থিয়েটারে যেতেন না, কখনও মদপান এমন কি ধুমপান পর্যন্ত করতেন না।
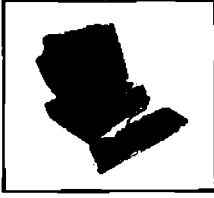
কিশোর বন্ধুরা, এই শিরোনাম দেখে তোমরা কি বিস্ময়ে থ' হয়ে গেলে? নাকি ভাবছো যে, আমার মাথাটি একেবারে খারাপ হয়ে গেছো! নাহ্ বিলকুল সব ঠিক হ্যায়। হ্যাঁ, অবশ্য আমি তোমাদেরকে এখন তোমাদের আর সব মানুষের মাথার কথাই বলবো। ভাবছি এ বিশ্লেষণ শুনে তোমাদের মাথাই আবার খারাপ হয়ে যায় কি না? যাক। আল্লাহ ভরসা। আমাদের দেহের ভিতর মাত্র তিন পাউন্ড ওজনের মস্তিষ্কের গঠন সবচেয়ে জটিল। এমনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কম্পিউটারের চেয়ে হাজার হাজার কোটি গুণ জটিল। ডাক্তার ওয়াল্টারের মতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মানুষের মত সমক্ষমতার একটি বৈদ্যুতিক বা এটমিক মস্তিষ্ক তৈরি করতে চাইলে পনের শত কোটি, কোটি টাকারও বেশি প্রয়োজন হবে। সংখ্যাটিকে অংকে লিখলে দাঁড়ায় ১৫০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০ টাকা। অর্থাৎ যে পরিমাণ টাকা দিয়ে বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক প্রায় দশ হাজার কোটি কম্পিউটার কেনা সম্ভব।..... এ্যাই থামো, শরীরে একটু চিমটি কেটে দেখোতো স্বপ্ন দেখছো কিনা? আরো মজার খবর এই মস্তিষ্ককে চালাতে এক হাজার কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-এর প্রয়োজন হবে। দৈনিক চালু রাখার জন্যে প্রয়োজন হবে কর্ণফুলির কাপ্তাইয়ের মতো তিন হাজার আড়াইশত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামগ্রিক উৎপাদন। সাবধান তোমরা কিন্তু ভয় পেয়ে যেও না, এই যান্ত্রিক মস্তিষ্কের আয়তন হবে আঠারোটি এক'শ তলা বিল্ডিংয়ের সমান। আমাদের মস্তিষ্কের সবচেয়ে ওপরের সাদা ঢেউ খেলানো অংশকে কর্ট্রেক্স বলে। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এই কর্ট্রেক্সকে সমান্তরালভাবে সাজালে এর আয়তন হবে দু'হাজার বর্গমাইলেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় ব্রুনাই দেশের সমান। চৌদ্দশত কোটি নিরপেক্ষ জীবকোষ দিয়ে কর্ট্রেক্স গঠিত। এ সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ একক জীবকোষকে নিউরন বলা হয়। এগুলি এতই ক্ষুদ্র যে কয়েকশত একত্রে একটি আলপিনের মাথায় স্থান নিতে পারে।

প্রতি সেকেন্ডেই শত শত হাজার হাজার নিউরন এসে ব্রেইনের প্রাথমিক স্তরে জমা হতে থাকে। এরা একেকটি ইলেকট্রোনিক সিগনাল যা শরীরের বিভিন্ন অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং মূল নিয়ন্ত্রণের আদেশ অতি দ্রুত হাজার কোটি সেলে ছড়িয়ে দেয়। ব্রেইনের এ সকল প্রতিক্রিয়া অনেক সময় সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের মাত্র একভাগ সময়ে ঘটতে পারে। আমাদের দেহের মেরুদণ্ডের মাধ্যমে নিউরনগুলি সারা শরীরের যন্ত্রপাতিগুলিকে সজীব তৎপর রাখে। এগুলির আবার অনেক স্বতন্ত্র বিভাগ রয়েছে যার সংখ্যা প্রায় ২৫০টি। যেমন কোন অংশ শোনার জন্য, কোন অংশ বলার জন্য, কোন অংশ দেখার জন্য আবার কোন অংশ অনুভূতিগুলিকে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল টাওয়ারে ট্রান্সমিট করার জন্য ব্যস্ত থাকে। এতে আবার বসানো হয়েছে একটি স্বয়ংক্রিয় শক্তিশালী 'মেমোরি সেল'। যার কাজ হলো নিত্য নতুন সংগ্রহগুলিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনের সময় তাকে 'রি ওয়াইন্ড' করে মেমোরিগুলিকে সামনে নিয়ে আসা। এই স্মৃতি সংরক্ষণশালা প্রতি সেকেন্ড ১০টি নতুন বস্তুকে স্থান করে দিতে পারে। পরম আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বপ্রকারের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বকে এক জায়গায় একত্র করে যদি এই মেমোরি সেলে রাখা যায় তাতে এর লক্ষ ভাগের একভাগ জায়গাও পূরণ হবে না। সুবহানআল্লাহ! আমরা আল্লাহর এ মহিমার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করবো ভেবে কূলকিনারা পাই না। প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা কি অনুধাবন করতে পারছো কত শক্তিশালী আমাদের এই মস্তিষ্ক! তবে দুঃখের বিষয়, আমরা এর হাজার ভাগের একভাগও কাজে লাগাই না বা লাগাতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞান এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের প্রত্যেকের আল্লাহপ্রদত্ত এই মহাশক্তিশালী কম্পিউটার (মস্তিষ্ক) কে কাজে লাগাতে পারবো। সুপ্রিয় কিশোর বন্ধুরা, আমরা এ আলোচনাটা শেষ করতে চাই একজন মহামনীষীর বক্তব্য দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, **'নো দাই সেলফ' অর্থাৎ নিজেকে জানো।'** এ যেন সেই আরবি প্রবাদেরই প্রতিধ্বনি **'মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু'** অর্থাৎ **যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পারলো সে তার প্রভুকে চিনতে পারলো।**

বড় যদি হতে চাও

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে মেধাবী মানুষটি হচ্ছে আমেরিকার পেনসিলভিনিয়া রাজ্যের ফেরিস এলগার। ৮৬ বৎসর বয়সী এ অসাধারণ মানুষটি স্কুল

কলেজের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না নিয়েও অনেক বিস্ময়কর কাণ্ড করেছেন। আই. কিউ টেস্ট বা বুদ্ধিমাপক পরীক্ষায় ফেরীসের বুদ্ধাংক ২০০ এর মধ্যে ১৯৭। প্রতি একশ কোটি মানুষের ভিতর মাত্র একজন বুদ্ধাংক ১৯৩-এর ওপর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে হিসাবে পৃথিবরি বর্তমান প্রায় ৬শ কোটি মানুষের ভিতর ফেরীসের মতো মাত্র ৬ জন লোক থাকার কথা। কিন্তু জন্মগতভাবে বুদ্ধি ও মেধার ক্ষেত্রে ফেরীসের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বললেই চলে। প্রকৃতপক্ষে ফেরীস একজন সুপার জিনিয়াস, ওর বুদ্ধি সাধারণ একজন মানুষের তিনগুণ প্রতিভাবানদের দ্বিগুণ। প্রতিভা সম্পর্কে তিনি যা বলেন তা তার মত অদ্বিতীয় মেধাবী ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করা যায় না। তিনি বলেন, "প্রতিভা আর কিছু নয় পরিশ্রম। প্রতিভার বিকাশে কঠোর পরিশ্রমই গুরুত্বপূর্ণ।' সুপ্রিয় বন্ধুরা, আমরা দেখছি সকল জিনিয়াসই প্রতিভা অর্জনের জন্যে পরিশ্রমের প্রতি গুরত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাদের জীবনে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করি তা হচ্ছে সুন্দর পদ্ধতি বা কৌশল। আমরা এখন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাদের সেই সকল মূল্যবান পদ্ধতিসমূহ আলোচনার চেষ্টা করবো।

অধ্যয়নের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক বিষয়সমূহ :

অধ্যয়নের টেকনিক নয় বরং যে সকল পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রতিভাকে আরো শাণিত করতে পারবো সে বিষয়গুলিই এখানে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

১. খাবার খাবারের পরিমাণের ওপর মস্তিষ্ক চালনা নির্ভর করে। ভালভাবে মস্তিষ্ককে কাজে লাগাতে চাইলে পেটে একটু ক্ষুধা রেখে খেতে হয়। রাসূল (সাঃ) যে নিজে অল্পাহার করেছেন ও আমাদের করার জন্য বলেছেন তা অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক। অতিভোজনের ফলে রক্ত মাথা থেকে পাকস্থলীতে হজম ক্রিয়ার জন্য নেমে আসে। তার ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। তদ্রুপ অনাহারও মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় সমস্যা করে। ভি. এইচ. মর্টাম তার "হিউম্যান নিউট্রিশান" গ্রন্থে ছাত্রদের মোট পাঁচবার খেতে বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে ছাত্রদের বারে বেশি খেতে হবে কিন্তু পরিমাণে কম।

২. কোষ্ঠশুদ্ধি : নিয়মিত কোষ্ঠশুদ্ধি না হলে পেটে জমা খাদ্যের অংশগুলি পঁচে যে গ্যাস হয় তা মস্তিষ্কের উপর সরাসরি বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্যে যাদের বদহজম আছে তারা মাথার কাজ বেশি করতে পারে না।

৩. চাই প্রচুর অক্সিজেন : মস্তিষ্ক চালনাকালে কার্টেক্সের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রের নিউরপুঞ্জের মধ্যে অত্যন্ত প্রবলবেগে বৈদ্যুতিক প্রবাহের ন্যায় এক প্রকার তীব্র প্রবাহ চলতে থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রবাহের গতি মেপে দেখেছেন। নিউরন-সৃষ্ট তরঙ্গ প্রবাহের আঁকাবাঁকা রেখাগুলি সেকেন্ডে দশ থেকে পনের বার পর্যন্ত স্পন্দিত হয়। এতে যে কি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তা সহজেই অনুমেয়। তাই যখনই মস্তিষ্কের বিশেষ কেন্দ্র সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন রক্ত সেখানে এসে সর্বপ্রকার শক্তি যুগিয়ে দেয়। রক্ত যে শক্তি দেয় তার প্রধান দুটি অংশের একটা হলো শর্করা এবং অন্যটা হলো অক্সিজেন। মস্তিষ্কের কঠোর স্নায়ুবিক কাজের জন্য যে পরিমাণ বাড়তি অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, তার পরমাণ স্বাভাবিক দেহ ধারণের জন্যে যেটুকু অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তার চাইতে দশ থেকে বিশগুণ বেশি। সুতরাং এই অতিরিক্ত অক্সিজেন যাতে রক্ত সংগ্রহ করতে পারে তার জন্যে প্রত্যেক মস্তিষ্কজীবীকে প্রত্যহ অন্তত দুঘণ্টা মুক্তবাতাসে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আশ্চার্য প্রফুল্ল চন্দ্র একাজটি না করায় পরিণত বয়সে খুবই অসুস্থ হয়ে যান। আর আমরা দেখি রাসূল (সা) সহ আরো যে সকল মনীষী ধ্যান করেছেন তারা প্রত্যেকেই বেছে নিয়েছেন বিশুদ্ধ বায়ুময় নিরিবিলি জায়গা। অর্থাৎ বিশুদ্ধ অক্সিজেন মগজের ক্ষমতাকে শাণিত করে।

৪. শরীরের জন্য ঘুম : ঘুম মস্তিষ্কজীবীদের এক অমূল্য ঔষধ। অনেকেই মনে করেন যারা বেশি পড়ালেখা করে তাদের কম ঘুমালেই চলে। কিন্তু ধারণাটি ভুল। বরং তাদেরই ঘুমের দরকার হয় বেশি। দু'টি কারণে তাদের ঘুমের দরকার হয় বেশি। প্রথমতঃ এতে কার্টেক্সের নিউরনগুলির পরিপূর্ণ বিশ্রাম ঘটে, দ্বিতীয়তঃ নিদ্রাকালে রক্ত নিজে বিশোধিত হয় এবং বাতাস থেকে প্রচুর পরিমাণে বাড়তি অক্সিজেন সংগ্রহ করে নেয়। আর তাই চার্চির নব্বই বৎসর বয়সেও বাঁর থেকে পনের ঘণ্টা করে মানসিক পরিশ্রম করতে পারতেন কেননা তিনি সেই বয়সে নয় ঘণ্টা করে নিদ্রা যেতেন।

৫. সময় ও পরিবেশ পড়ালেখার জন্যে সময় ও পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআন অধ্যয়নের জন্য শেষরাতের সময়টিকে বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা সে সময়ে সারা পৃথিবী থাকে নিস্তব্ধ আর পরিবেশটা থাকে অনেকটা ঠাণ্ডা। সুতরাং কোলাহলমুক্ত পরিবেশ আর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়া মগজকে কার্যকরি করার জন্যে বেশি উপযোগী। আর তাই গরমদেশের চাইতে শীতপ্রধান দেশের মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশি মেধাবী হয়।

একজন কিশোরের গল্প বলবো, 'সে মাইলের পর মাইল হেঁটে গিয়ে বই ধার করে এনে পড়তো। তার পড়ার সময় ছিল দিনের কাজের শেষে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো, কামরার মধ্যে চুল্লিতে একটা নতুন কাঠ জ্বালিয়ে সেই আলোয় সে পড়তো, ঘুমে ঢুলে না পড়া পর্যন্ত। কালক্রমে সেই হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন।
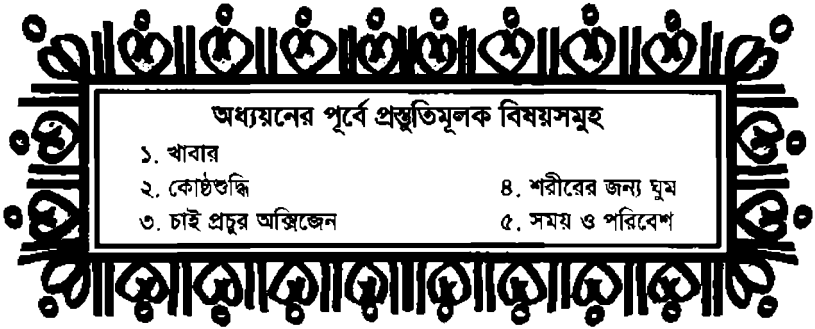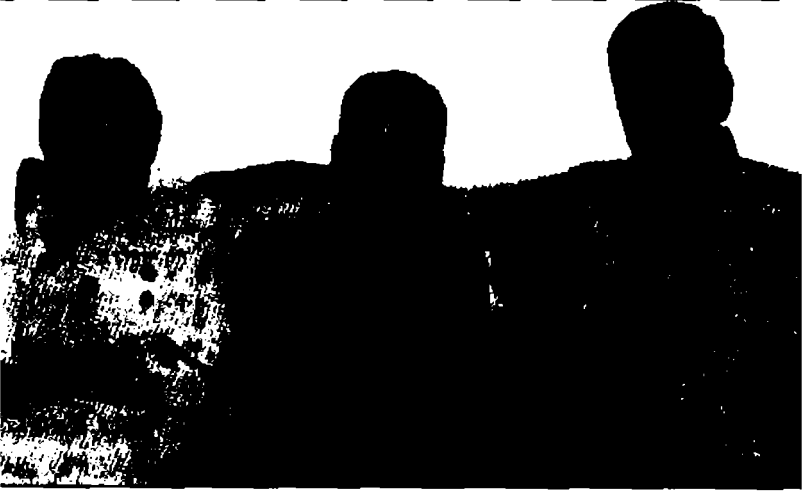
মা জাহানারা খান চৌধুরী ও মামা জাহেদ উদ্দিন খান চৌধুরীর সঙ্গে
বাংলাদেশের সর্ব কনিষ্ঠ বৈমানিক কিশোর আলী রাকীব

এ পর্যায়ে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমাদেরই এক নতুন বন্ধু বাংলার দামাল কিশোর, যার কৃতিত্বে সবার বুক ভরে যায়। আর চোখে আসে আনন্দের অশ্রু। ছেলেটির নাম আলী রাকিব। ১৯৯৯ সালের ২২শে এপ্রিল, তখন তার বয়স সবে মাত্র তের বছর পাঁচ মাস। ঐ দিনেই রোদ ঝলমল সকালে জীবনে প্রথমবার বিমানে চড়ে নয়, একেবারে নিজে বিমান চালিয়ে আকাশে উঠেছিল সে। আমেরিকার ফ্লোরিডার অর্মন্ডবিচ ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট। ছোট্ট রাকীব, গ্রাউন্ডচেকিং শেষে, কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ক্লিয়ারেন্স পেয়ে রানওয়ের ওপর দিয়ে ৯৯ নট বেগে সা-সা ছুটে চলা সেসনা-১৭২ কে এক ইঞ্চি পরিমাণ থ্রটল টেনে ভূমির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তুলে এনেছিল উর্ধ্বপানে। হয়তো তখন তার পেটটা চিনচিন করছিল, রক্তিম গালদুটি ফ্যাকাশে হয়েছিল, চোখ দুটোও হয়েছিল স্থির- আর একটু একটু ভয় লেগেছিল বৈকি। কিন্তু তার পরই দূরন্ত ঈগলের ডানা মেলে ওড়ার অপার আনন্দ। বিক্ষুব্ধ-ভয়াল আটলান্টিকের দু'হাজার ফিট

ওপর দিয়ে (এর ওপরে ওঠার অনুমতি তার ছিল না)। সে উড়েছিল প্রায় পৌনে দু'ঘন্টা। (ওহ! গা ছমছম করে ওঠার মতো ঘটনা; তাই না?) সাথে সাথে সেই পিচ্চি দস্যি ছেলেটি সৃষ্টি করলো এক নতুন রেকর্ড, সে হলো আটলান্টিকের ওপর দিয়ে ওড়া সর্বকণিষ্ঠ বাংলাদেশী বৈমানিক। এর পরের দু'সপ্তাহের মোট ষাট ঘন্টা ওড়ে, সে নানা করসৎ রপ্ত করে। মনে হয় চিৎকার করে আটলান্টিকের ওপারে খোদ আমেরিকায় পৌঁছে দেই আমাদের বুলন্দ আওয়াজ সাবাস! রাকিব, সাবাস!!!

মাকে নিয়ে ওরা চার ভাইবোন থাকে আমেরিকায়। বাবা আলীমুল্লাহ কুয়েত এয়ারলাইন্সের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, মামা সেখানেই কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, বড়ভাই আলীরেজা আমেরিকান এয়ারলাইন্সে এরাস্পেস ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত। কিশোর বন্ধুরা তোমরা কি ভাবছো এতকিছুর সুবাদেই কি সে পেয়েছিল বর্ণাঢ্য সুযোগ? কিন্তু না, আসল ঘটনা অন্য রকম। কেম্বারল্যান্ড স্কুলের জুনিয়র লেভেল পরীক্ষায় সে কৃতিত্বপূর্ণ জিপিএ ৪.০ পয়েন্ট অর্জন করে। প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষাতেই ৯৪ থেকে ১০০ নম্বর পেলেই কেবল তা অর্জন করা সম্ভব। তার মূল কৃতিত্ব এখানেই, সে এই জিপিএ পয়েন্টের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মার্কধারী প্রথম বাংলাদেশী। শুধু কি তাই? কাউন্টি বোর্ড অব এডুকেশনের পক্ষ থেকে তাকে দেয়া হয় ন্যাশনাল জুনিয়ার অনার্স সোসাইটির পদক। আরো আছে, আমেরিকার সেরা তিনশ মেধাবী ছাত্রের সাথে ওয়াশিংটন ডিসি সফরের আমন্ত্রণ, এমনকি খোদ হোয়াইট হাউসেও ভ্রমণ। কিন্তু রাকিবের জন্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরস্কার ছিল এ্যামব্রেরিডাল এ্যারোনটিক্যাল ইউনিভার্সিটির ইয়ং ঈগল প্রোগ্রামের আমন্ত্রণটি। এ প্রোগ্রামে প্রতি বছর আমেরিকার স্কুল পর্যায়ের মেধাবী ছাত্রদের ভিতর থেকে সেরা পাঁচজনকে বাছাই করা হয় বিনা খরচায় বিমান চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে। আমাদের আলী রাকীব হলো, এ বছর সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেই সেরা পাঁচজনের একজন। আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করার জন্য চলো আমরা সবাই তাকে জানাই বুকভরা ভালবাসা আর অভিনন্দন। রাকিবদের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়া গ্রামে।

ইস্ ভূমিকাতেই কত্তো কথা হলো, জানি না তোমাদের এত্তো প্যাচাল ভাল লাগে কিনা? নাকি রেগেমেগে, আমার কল্পিত আকৃতি বেচারার প্রতি বারবার চোখ রাঙ্গাও! যাক্ চলো, আর দেরি নয় ঝটপট শুরু করি কিছু কাজের কাজ।

হেডিং দেখেই তোমরা হৈ চৈ করো না কিন্তু। আমাকে আগেভাগে একটু খোলাসা করতে দাও। আচ্ছা বলোতো, প্রতিদিন আমাদের কত ঘণ্টা সময়? সবাই বলবে ক্যানো, চব্বিশ ঘন্টা! এটা কি ইলাস্টিকের মতো টেনেটুনে এক-আধটু বড় করা যায়? হয়তো হেসে কুটিকুটি হয়ে বলছো নাহ; এক্কেবারে না। এটা অসম্ভব ব্যাপার। আসলেও ঠিক তাই। তাহলে উপায়? চলোই না চেষ্টা করে দেখা যাক, কোন সমাধান বের করা যায় কিনা? আমরা চব্বিশ ঘণ্টায় অর্থাৎ সারাদিনে মোটামুটি প্রধান প্রধান কি কি কাজ করি? পড়ালেখা, গোছল, খাওয়া, নামাজ, ঘুম, খেলাধুলা ইত্যাদি তাই না? এবার এসো, - আমরা একটু বিশ্লেষণ করি গান্ধিজী যেখানে গোছল করতেন সেখানে প্রতিদিন একটি করে গীতার শ্লোক লিখে রাখতেন। অতঃপর গোছলের সময় তা গানের সুরে সুরে মুখস্থ করে ফেলতেন। আমরাও এভাবে প্রতিদিন একটি করে মহামনীষীদের বাণী শিখতে পারি। আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অন্য লোকদের সাথে কথোপকথনের সময়ও ফাঁক দিয়ে বই পড়তেন এবং গ্রাম ভ্রমণের সময় প্রতিদিন প্রায় তিনটি করে বই পড়তেন। আর নেপোলিয়ান যুদ্ধে গেলেও তার সাথে থাকতো একটি চলমান লাইব্রেরি এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বই পড়তেন। রাসূল (সাঃ) এর উপর প্রচন্ড রণাঙ্গনেও নাযিল হত মহাগ্রন্থ আল কুরআন, আর তিনি তা যথাযথভাবে অন্তস্থ করতেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত হাদিস সংকলন 'সহীফা' সংরক্ষিত থাকতো সর্বদা তার তলোয়ারের খাপের ভিতর। ক্যাডম্যান বার বৎসর বয়সে খনির মজুর হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন। ঝুড়ি থেকে কয়লা খালাসের পর প্রতি দুই মিনিট অবকাশে খনির অন্ধকারে মৃদু আলোতে দাঁড়িয়ে একটু বই পড়ে নিতেন। আহারের সময়ও তিনি পড়া চালিয়ে যেতেন। (আমরা অন্তত বড়ভাই বা আব্বা, আম্মার সাথে এ সময় কঠিন বিষয়গুলি পর্যালোচনা করতে পারি)। এভাবেই তিনি নিজকে স্বশিক্ষিত করে যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন। সোহারাওয়ার্দির কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল, টয়লেটে বেশি সময় লাগতো তাই কমোডে বসেই তিনি সেদিনের পত্রিকাগুলি পড়ে শেষ করতেন। মহাকবি শেখ সাদী ঘুমের ঘোরেই স্বপ্নযোগে পেয়েছিলেন তার জগৎ বিখ্যাত নাতে রাসূল (সাঃ) এর সর্বশেষ শ্লোক "সাল্লু আলাইহি ওয়া আ'লিহি"। অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী ঘুমের ঘোরেই তাদের বিখ্যাত আবিষ্কারের তত্ত্ব পেয়েছেন। সুতরাং প্রমাণ হলো, বই সাথে না থাকলেও

চব্বিশ ঘণ্টা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পড়ালেখায় থাকা যায়। তাহলে আমরা কি সারাদিন শুধুমাত্র পাঠ্যবই নিয়ে পড়ে থাকবো? ভাবছো ওহ! এটাতো কুইনাইনের চেয়েও তেতো। আসলে আমি কিন্তু তোমাদের সর্বক্ষণ বইয়ের পোকা বা গোবরেপোকার মত পাঠ্যবই নিয়ে পড়ে থাকতে বলবো না। খোঁজ নিয়ে দেখ, এবার যারা এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষায় বোর্ডস্ট্যান্ড করেছে তারা সর্বোচ্চ ১০/১২ ঘণ্টা করে পাঠ্যবই পড়েছে। আর বাকি সময় পত্রিকা অন্যান্য বই পড়েছে। সারাদিন যারা শুধু পাঠ্যবই নিয়েই থাকে তাদের চিন্তার জগৎ হয়ে যায় সংকীর্ণ। তারা কখনো খুব ভাল রেজাল্ট করতে পারে না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মায়ের কোলের শিশুটিই থেকে যায়। সময় নষ্ট হবে বলে সাঁতার কাটতে জানে না, সাইকেল চালনা জানে না। এমনকি অনেকে বলতেও পারবে না চেচনিয়া, কসাভো এগুলি কি? কোন ব্যক্তির নাম? কোন ট্যাবলেটের নাম? নাকি কোনো দেশের নাম? তাই অনেক ক্ষেত্রে তাদের জীবনটা হয়ে যায় সেই নৌযাত্রীর মতো "ষোল আনাই মিছে।" সুতরাং আমাদের পাঠ্যবইয়ের ফাঁকে ফাঁকে কিছু সময় চরিত্রগঠনের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থ, সাধারণ জ্ঞানের জন্য পত্রিকা, অনুপ্রেরণার জন্য মহামনীষীদের জীবনী পড়ার সময় রাখতে হবে। এতে করে পাঠ্যবিষয়টি ভাল করে রপ্ত হবে। যেমন শুধু গোশ্‌ত রান্না করলে খাওয়া যায় না, তার সাথে দিতে হয় তেল, মরিচ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, গরমমশলা ইত্যাদি। তবেই তা হয় মুখরোচক আর হজমকারক। স্পিনোজা বলেছেন, **"ভালো খাদ্য বস্তুতে পেট ভরে, কিন্তু ভালো বই মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।"** দেকার্তে বলেছেন, **"ভালো বই পড়াটা যেন গত শতকগুলির সেরা মানুষদের সাথে কথা বলা।"** ইউরোপ কাঁপানো নেপোলিয়ান কি বলেছেন জান? তিনি বলেছেন, **"অন্তত ষাট হাজার বই সঙ্গে না থাকলে জীবন অচল।"** ভারতে বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক জন মেকলে বলেছেন আরও মজার কথা, **"বরং প্রচুর বই নিয়ে গরীব হয়ে চিলোকোঠায় থাকবো, তবু এমন রাজা হতে চাই না যে বই পড়তে ভালোবাসে না।"** আর সবচাইতে চরম কথাটি বলেছেন নর্মান মেলর, **"আমি চাই বই পাঠরত অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়।"** আর রাসূল (সা) বলেছেন সবচাইতে মূল্যবান কথাটি, **"জ্ঞান হচ্ছে তোমাদের হারানো সম্পদ সুতরাং যেখানে তা পাও কুড়িয়ে নাও"**।

পড়ার সুন্দর পদ্ধতি

মানুষের দেহের ওজনের চল্লিশ ভাগের একভাগ হলো তার মস্তিষ্কের ওজন। আর মৌমাছির দেহের ওজনের একশত সাতচল্লিশ ভাগের একভাগ হলো মস্তিষ্কের ওজন। ক্ষুদ্র এই পতঙ্গগুলি মস্তিষ্ককে পূর্ণভাবে ব্যবহার করে। তাদের বানানো কারুকাজময় মৌচাক আর তাদের শাসনব্যবস্থা দেখলেই তা বুঝা যায়। হাজার মানুষের ভেতর একজনও তার মস্তিষ্কের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে না বরং সর্বদা মাথাকে একটি বোঝা হিসেবেই নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু বেড়ানোর জন্যে তো আর মাথার দরকার নেই একটি মেরুদণ্ড হলেই চলে। যাক্ বন্ধুরা, একটু বোধহয় কড়া কথা বলে ফেল্লাম। ডোন্ট মাইন্ড; আসলে কথাটা কিন্তু তোমাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়নি। বরং আমিসহ সর্বসাধারণের জন্যেই এটি প্রযোজ্য। এবার এসো, আমরা দেখি কিভাবে আমাদের মাথাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যায়। অন্তত পড়ার কাজে।

আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ার জন্য একটি সুন্দর সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। সংক্ষেপে এটাকে বলা হয় SQ3R system, The SQ3Rstands for,

*** Survey** (সামগ্রিকভাবে দেখা, জরিপ বা পরিদর্শন করা, পরীক্ষা করা, সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করা):

অর্থাৎ পঠিতব্য বই বা অধ্যায়কে সামগ্রিকভাবে এক নজর দেখা। এজন্যে ভূমিকা, সূচিপত্র, অধ্যায়সমূহের সংক্ষিপ্তসার দেখে নেয়া। যাতে করে সামগ্রিক বই সম্পর্কেই একটি প্রাথমিক ধারণা হয় এবং এতে সকল অধ্যায়ই অপেক্ষাকৃত সহজ ও পরিচিত লাগবে।

*** Question** (প্রশ্ন, প্রশ্নবোধক বাক্য) :

শুধুমাত্র অধ্যায়ে দেয়া প্রশ্ন বা স্যারদের সাজেশনের প্রস্তুতি নিলেই হবে না। পঠিত বিষয়ের দশদিক থেকে যত প্রকার প্রশ্ন হতে পারে তা খুঁজে বের করতে হবে। অতঃপর শিক্ষক, অভিজ্ঞজন, সহায়ক, অন্যান্য বই থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে। এতে করে, সে অধ্যায় সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা হবে। যেখান থেকেই প্রশ্ন আসুক তা হবে 'জলবৎ তরলং'।

*** Read** (পড়, পড়তে পারা, অর্থ উদ্ধার করা)

অতঃপর উদ্ধারকৃত উত্তরসহকারে অধ্যায়টি ভালভাবে পড়া। প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝে বুঝে পড়া। মনের ভিতর পঠিত বিষয়ের একটি চিত্র তৈরি করা। প্রতিটি প্যারার কি-ওয়ার্ডসমূহ (যে শব্দ দেখলে সমগ্র প্যারাটিই মনে আসে) পাশে রঙ্গিন পেন্সিল দিয়ে লিখে রাখা। মূল্যবান বাক্য বা উদ্ধৃতির নিচে রঙ্গিন পেন্সিল দিয়ে লাগিয়ে রাখা। এতে করে পরবর্তীতে দশভাগের একভাগ সময়ে তা রিভিশন দেয়া যাবে।

*** Receite** (আবৃত্তি করা, ফিরিস্তি দেওয়া, তেলাওয়াত করা)
একটি বিষয়কে খুব ভালভাবে আত্মস্থ করার জন্য বারবার আবৃত্তির কোন বিকল্প নেই। সূরা আর-রাহমানের সবচেয়ে মৌলিক বক্তব্য "অতএব মানুষদের রবের কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে"- আয়াতটি মানুষের ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে ৭৮ আয়াতের এ সূরায় বাক্যটি ৩১ বার ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ কুরআনে হাফেজ আছেন। তারা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রায় ৬৬৬৬টি আয়াত জের, জবর, পেশ, নোক্তাসহকারে মুখস্থ করেছেন। যদিও এটা আল্লাহর কালামের একটা মুজিজা আর তার পরেই আছে হাফেজদের বার-ংবার আবৃত্তি। সুতরাং মেলিক বিষয়সমূহ বারবার আবৃত্তি করা দরকার।
*** Revise** (পুনর্বিবেচনা করা, সংশোধন ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে পুনর্বার পড়া) একটি বিষয় আত্মস্থ হওয়ার পর প্রথম কয়েকদিন কয়েকবার হেঁটে হেঁটে, সকালে মর্নিংওয়াকের ফাঁকে ফাঁকে বা পড়ার টেবিলে বসে চোখ বন্ধ করে, বই না দেখে রিভিশন দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর পরবর্তীতে তা আরো ভালভাবে ঝালাই করার জন্যই সম্ভব হলে সপ্তাহে একবার অথবা কমপক্ষে মাসে একবার রিভিশন দিয়ে তারপর না দেখে লেখা উচিত। দৈনিক কিছু কিছু আর রমজান মাসে তারাবিহ নামাজে সমগ্র কুরআনকে রিভিশন দিয়ে হাফেজরা এই বিশাল কুরআন মজীদকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মুখস্থ রাখছেন।
আজকে শুধুমাত্র আমেরিকায় চালু একটি আদর্শ সিস্টেমকে তোমাদের সামনে বিশ্লেষণ করলাম। এটিকে বাস্তবায়ন করা শুরু করো। দেখ তোমাদের কোন উন্নতি হচ্ছে কিনা?
এ পর্যায়ে একটি মজার কথা বলছি, যেটি বলেছেন ফ্রান্সিস বেকন, **"কতগুলি বইকে শুধু চাখতে হবে, কতগুলিকে গিলতে হবে এবং কিছুসংখ্যক বইকে চিবুতে ও হজম করতে হবে।"** এখন দায়িত্বটা তোমাদের ঘাড়েই থাকলো, মগজ, বিবেক আর বড়দের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে হবে কোনটি কোন ধরনের বই। কারণ একটি ইটালীয় প্রবাদ হলো, **"খারাপ বইয়ের চাইতে নিকৃষ্টতম তস্কর আর নেই"** সুতরাং সাবধান!
এবার একটা দুঃখের কাহিনী বলতে চাই। কারণ সোনার চামচ মুখে দেওয়া মানুষ বেশি বড় হতে পারে না। বরং যারা ব্যক্তি ও সমাজের দুঃখ বুকে ধারণ করে তা প্রতিরোধে এক দুর্দমনীয় শক্তি নিজের ভিতর সৃষ্টি করতে পারে, ইতিহাস সাক্ষী তারাই হয় মহামানব।
এস এম আশিকুর রহমান। সে যশোর বোর্ডের অধীনে গত '৯৯ এইচ. এস.

সি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। সে লোহাগাড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয় থেকে তিন বিষয়ে লেটারসহ ৮৭০ নম্বর পেয়েছে। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য! তার পিতা শেখ ফিরোজ আহমদ (বাদশা মিয়া) সহায় সম্পদহীন, কপর্দকশূন্য এবং 'দিন এনে দিন খাওয়া' এক সামান্য বর্গা চাষী। মা 'নুন আনতে পানতা ফুরায়' এমন সংসারের গৃহিনী। গত পরীক্ষায় সে কোন প্রাইভেটও পড়তে পারেনি। আর এবার তার কোথাও ভর্তি হওয়াও সমস্যা। একটি প্রতিভা কি এমনি করেই ঝরে যাবে? আশপাশে ছড়িয়ে আছে এমন হাজারো আশিকুর। তাদের খোঁজ কর। তাদের হাত ধর! সম্ভাব্য সহযোগিতা কর।

স্পিনোজা বলেছেন, "ভালো খাদ্যবস্তুতে পেট ভরে কিন্তু ভালো বই মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।"
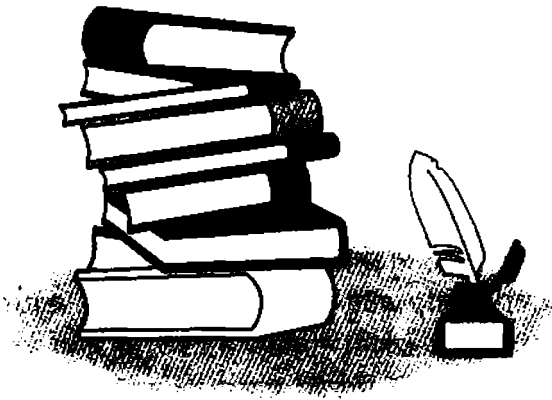
ইসলামী ব্যাংক স্কুল এন্ড কলেজ (ইংলিশ মিডিয়াম)- এর ছাত্র-ছাত্রী

একটি গল্প বলছি, শোন। আর ও হ্যাঁ, এটা একদম সত্যি গল্প কিন্তু! শোনই তাহলে। ওহ! কি ভয়ঙ্কর দাঁতালো ডাইনোসর" মনে হয় যেন হঠাৎ কোন ভুতুড়ে গ্রহ থেকে লাফিয়ে পড়েছে। কিন্তু একি! ওর বিশাল পেটের নিচে একঝাক রং-বেরংয়ের শিশু দেখা যাচ্ছে। ওরা কারা? কি ওদের পরিচয়? সোনাঝরা রোদ্দুরের এক সুন্দর সকাল। সেদিন ছিল ক্যালেন্ডারের শেষ মাথায় ৯৯ সালের বারোই অক্টোবর। তখন আগারগাঁওয়ের জাতীয় বিজ্ঞান যাদুঘরের সূর্যঘড়িতে সকাল নয়টা ছুঁইছুঁই করছে। হঠাৎ ক্যাচ্‌কচ্‌ ব্রেক কষে প্রধান ফটকের সামনে থমকে দাঁড়ালো একটি ক্রীম কালারের টয়োটা হায়েছ। আর তার দরজাটি খুলতেই যেন টর্ণেডোর বেগে বেরিয়ে এলো একঝাঁক রঙ্গিন প্রজাপতি। আর উড়ে বেড়াতে লাগলো বিজ্ঞান যাদুঘরের প্রজেক্টসমূহের এ মাথা থেকে ও মাথা। মুখে তাদের খৈ ফোটার মতই বাংলা ইংরেজি প্রশ্ন। তাদের উত্তর দিয়ে শান্ত করতে রীতিমত গলদঘর্ম হচ্ছে যাদুঘরের কর্মকর্তারা। হয়তো কর্মকর্তাদের ঠোঁটের কাছে কান পাতলেই শোনা যেত বিড়বিড়ে উচ্চারণ 'উফ কি বিচ্ছুদের পাল্লায় পড়েছিরে বাবা!" হ্যাঁ, এটা হলপ করে বলা যায়, তাদের ইংরেজি প্রশ্নবানে জর্জরিত যে কোন সাধারণ ব্যক্তিই এ কথা বলতে বাধ্য। এরা সাধারণের কাছে ঐ বিজ্ঞান যাদুঘরের ডাইনোসরের চাইতেও

শক্তিশালী। এর কারণ একটিই, বাংলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজির ওপর এদের দক্ষতা। ওরা কারা? কি ওদের পরিচয়? ওরা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক স্কুল এন্ড কলেজ (ইংলিশ মিডিয়াম) এর প্লে গ্রুপ থেকে কে.জি পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী। যাদের বয়স মাত্র চার থেকে সাত বছরের ভিতরে। ওরা ইংরেজি শুধু পড়তেই পারে তাই নয় বরং বলতে পারে, লিখতে পারে, আরেকজনের কথা বুঝতে পারে এমন কি আবৃত্তি কিংবা গানও গাইতে পারে। অনেকেই বলেন ইংরেজি শিখলে মানুষ বিদেশীদের মতোই চরিত্র শূন্য হয়ে যায়। এমনকি তাদের ধর্মও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এরা- এদের অবস্থা কি? এরা নামাজ পড়ে, গজল গায় আর সত্যিই সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। এরা বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শেখার পাশাপাশি শিখছে মহাবিশ্বের আদর্শ ইসলাম।

তোমরা হয়তো ভাবতে পারো হঠাৎ বৃটিশ-ভারতের শিক্ষা উপদেষ্টা জন ম্যাকলের মতো আমিও কেন ইংরেজির পক্ষে ওকালতি করছি। আসলে কারণ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। জন ম্যাকলে চেয়েছিলেন তৎকালীন ভারত বর্ষকে শাসন করার জন্য এমন একদল ইংরেজি শিক্ষিত লোক তৈরি করতে যারা রক্তে বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু চিন্তা কর্মে হবে বৃটিশ। এককথায় বৃটিশদের দালাল। আর আমরা চাই, মানুষের জ্ঞান, যোগ্যতা আর অভিব্যক্তি প্রকাশে যেহেতু ভাষার কোনই বিকল্প নেই সুতরাং শক্তিশালী ভাষাসমূহ আমাদের আয়ত্তে থাকা দরকার। আচ্ছা বন্ধুরা, তোমরা কি জান বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক মানুষ কোন ভাষায় কথা বলে? চোখ বন্ধ করে একটু চিন্তা করেই দেখনা। কি খুঁজে পেলে মনের বিশাল ভূবনে এর উত্তর? আচ্ছা বলছি- তাহলে শোন, সেটি হচ্ছে মান্দারিন (চাইনিজ) ভাষা। উহ্! আবার নাক সিটকে বলো না "কি এক বিদঘুটে ভাষার নাম বললেন জীবনে শুনিনি।" আসলে জাতি হিসাবে সংখ্যায় চাইনিজ বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ (প্রায় শোয়া'শ কোটি) হওয়ায় এ ভাষার অবস্থা এমন। কিন্তু জাতি হিসাবে দেখলে দেখা যাবে পৃথিবীতে ইংরেজি ভাষাভাষির সংখ্যা সর্বাধিক। অপরদিকে বিশ্বের প্রায় সকল জাতিই তাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজির ব্যবহার করে থাকে। সে হিসাবেই ইংরেজি এখন আর শুধুমাত্র ইংরেজদের ভাষা নয় বরং বিশ্বজনীন ভাষা। অপরদিকে যে মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তি আজ নিয়ন্ত্রণ করছে সারা পৃথিবী তার পঁচানব্বই ভাগই ইংরেজিতে। শুধু কি তাই, ব্যবসা বলো, উচ্চশিক্ষা বলো, যোগাযোগ বলো, বিজ্ঞান বলো, সাহিত্য বলো সব কিছুর সিংহভাগ ইংরেজি ভাষার করায়ত্তে। এমনকি এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলীর জন্যে নোবেল পুরস্কার পেতেন না

যদি না তা অনুদিত হতো ইংরেজি ভাষায়। এক কথায় ইংরেজি ছাড়া বর্তমান বিশ্ব অচল। আমি বলছি না তোমাদের প্রত্যেককেই ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো বহুভাষাবিদ হতে হবে। তবে বাংলার পাশাপাশি একজন যোগ্য মানুষ হিসাবে তোমাদের ইংরেজি জানা দরকার। ঠিক তেমনি একজন মুসলিম হিসাবে জানা দরকার কুরআনের ও জান্নাতের ভাষা আরবি। আর তোমাদের আরবি শেখার সবচেয়ে উপযুক্ত মাস হচ্ছে রমজান মাস। যেহেতু রমজান মাস কুরআন নাজিলের মাস, রহমত ও বরকতের মাস- সুতরাং এ মাসে আরবি এবং সহীহ কুরআন তেলাওয়াত শেখা সবচেয়ে সহজতর। তবে আজকে আমরা ইংরেজির গুরুত্বের বিষয়েই কথা বলবো। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ভাষা শিক্ষার গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন "আল্লামা হুল বায়ান' অর্থাৎ তিনি মানুষকে কথা বলার (ভাষা ব্যবহারের) শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (সা) তাঁর নিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী যায়েদ ইবনে সাবেত আনসারীকে ইহুদীদের ভিতর দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্যে তাদের ভাষা হিব্রু শিখতে বলেন। যায়েদ (রা) মাত্র তেরদিনে হিব্রু ভাষা আত্মস্থ করেন। তিনি অপরাপর চারটি ভাষায়ও কথা বলতে পারতেন। সুতরাং বর্তমান সময়ে ইসলামকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইংরেজি ভাষা জানা দরকার। বিশ্ববিখ্যাত, জ্যামিতির জনক পিথাগোরাস বলতেন, 'মানুষের জীবন অলিম্পিক গেমসের মতো। কিছু লোক পুরস্কার নেয়ার জন্য মাঠে খেলতে নামে, অন্যরা দর্শকের কাছে ছোটখাট রঙচঙে জিনিস বিক্রি করে সামান্য লাভের আশায়। আর এক ধরনের লোক আছে যারা কিছু চায় না, কেবল তামাশা দেখে'। কিশোর বন্ধুরা, তোমাদের ভাবতে হবে তোমরা কোন দলে থাকতে চাও!

১. চ্যাম্পিয়ান হওয়া প্রত্যাশী খেলোয়াড়দের দলে?

২. সামান্য লাভ প্রত্যাশী বিক্রেতাদের দলে?

৩. শুধু হাততালি দেয়া দর্শকদের দলে?

যদি, চ্যাম্পিয়ান হওয়া প্রত্যাশী খেলোয়াড়দের দলে যেতে চাও তাহলে কষ্ট করতে হবে, সাধনা করতে হবে। একটি করুণ ঘটনার কথা তোমাদের বলছি, তোমাদের কি মনে আছে ১২ নভেম্বর ১৯৯৭ সালে ভারতের মাটিতে দুটি সৌদি ও কাজাকাস্তানের বিমান মুখোমুখি সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়? এতে উভয় বিমানের প্রায় ৩৪৯ যাত্রীর সবাই মারা যায়। তোমরা কি জান এ সংঘর্ষের কারণ কি? কাজাকাস্তানের পাইলটকে কন্ট্রোলরুম থেকে বলা হয়েছিল সে যেন তার বিমানকে আরও ওপরে না তুলে, কারণ সেই সমান্তরালে একটি সৌদি বিমান আসছে। কিন্তু কি

দুর্ভাগ্য! কাজাক পাইলট ইংরেজি সেই নির্দেশটি বুঝতে পারেনি। যারফলে এই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ।

করুণতম ঘটনা বলছি, তোমরা তো জানই ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরে আমেরিকা ছুড়ে মারে বিশ্বের সর্বপ্রথম এটমবোম 'লিটলবয়'। কিন্তু তার পিছনে কারণ ছিল কয়েকদিন আগে মার্কিন নৌবন্দর পার্লহারবারে জাপানের ধ্বংসযজ্ঞ। আর তার পিছনে কারণ ছিল ঐ ইংরেজি না বুঝা। মিত্রবাহিনীর একটি গোপন বেতারবার্তা জাপানীরা ধরতে পেরেছিল। ফলে তারা ধরে নেয় আমেরিকা পার্লহারবার থেকে জাপান আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এই ইংরেজি না বুঝে, ভুল ধারণার ভিত্তিতেই তারা আগেভাগে পার্লহারবারে হামলা করে। যার ফলশ্রুতিতেই সংঘটিত হয় স্মরণকালের ভয়াবহতম হিরোশিমা ও নাগাসাকির বোমা হামলা। সুতরাং বুঝতেই পারছো বর্তমান সময়ে ইংরেজি না জানাটা শুধু উন্নতি থেকে পিছিয়ে থাকাই নয় বরং অনেকক্ষেত্রে আত্মহত্যারও শামিল। গুরুত্ব নিয়ে এত আলোচনার পর হয়তো তোমরা রাগ করে বলছো ঢের হয়েছে আর দরকার নেই। এখন মনে হয় তোমাদের প্রশ্ন থাকবে বরং বলুন কিভাবে শুরু করা যায়'। আসলে এই শুরু করার বিষয়টিই কিন্তু কঠিন। কয়েক বছর আগে ইতালীতে দুই বন্ধুর ভিতর 'ডিম আগে না মুরগী আগে' এ নিয়ে প্রথমে বিতর্ক, অতঃপর ঝগড়া তারপর একজন কর্তৃক আরেক প্রিয় বন্ধুকে গুলি করে হত্যা । সুতরাং এখানেও ইংরেজি বিশেষজ্ঞদের ভিতর বিতর্ক গ্রামার আগে না স্পোকেন আগে? আমি গরীব মানুষ (ইংরেজীতে) তাই এ ধরনের উচ্চাঙ্গের বিতর্কে জড়াতে চাই না। তবে সব কিছুরই একটি প্রাকৃতিক দিক আছে যেমন একটু চিন্তা করলে আমরাই খুঁজে পাব কিভাবে আমরা ছোট্টবেলায় ভাষা শিখেছি। যেমন আমরা যখন কথা বলি তখন ছোট্ট শিশুরা চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার মানে মনোযোগ দিয়ে শোনে। তারপর ধীরে ধীরে মা-আ, মামা, আল্লা-হ ইত্যাদি শব্দ দিয়ে তার কথা বলা শুরু করে। এর অনেক পরে সে পড়তে শিখে, ধীরে ধীরে লিখতে এবং সবশেষে গ্রামার অর্থাৎ নিয়মকানুন। এ কথাটি প্রমাণের দরকার নেই, একটি ছোট্ট শিশুর দিকে তাকালেই বুঝা যায়। আমরা সকলেই মাতৃভাষা শিক্ষার এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। সুতরাং আমরা ইংরেজিও শিখবো প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে।

১. বেশি বেশি শোনা : (বিটিভি নিউজ, বিবিসি, সিএনএন, স্পোকেন ক্যাসেট)

২. ভুল হোক শুদ্ধ হোক বেশি বেশি বলা : এ জন্যে নির্দিষ্ট পার্টনার থাকলে এবং সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন পর্যালোচনা বা বিতর্কের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়।

৩. না বুঝলেও পড়া : পাঠ্যবই, প্রতিদিনই নিউজ পেপার, বিশ্বের সেরা সেরা লেখকদের লেখা গল্পের বই ইত্যাদি পড়া।

৪. বেশি বেশি লেখা : বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চিঠিপত্র, পত্রিকায় চিঠিপত্রের কলামে নিয়মিত লেখা।

৫. শব্দভাণ্ডার বাড়ানো : প্রতিদিন কমপক্ষে ১০টি শব্দ মুখস্থ করা এবং নিয়মিত সেগুলির ব্যবহার করা।

৬. মাঝে মাঝেই গ্রামার দেখা : লেখনী, কথাবার্তাকে সঠিক রাখার জন্যে মাঝে মাঝেই গ্রামার বই দেখা জরুরি।
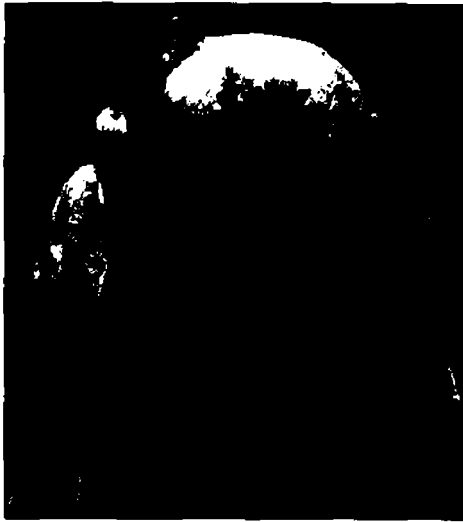
সুমো কুস্তিগীর ও কোশিনিকি

এবার এসো তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই এক জাপানী ক্ষুদে নতুন বন্ধুর সাথে। ও কিন্তু ভীষণ দুষ্টু দেখ কেমন? নিজের নামটি পর্যন্ত আমাদের বলেনি। তবু আমাদের বন্ধুত্বের হাত ওর দিকে প্রসারিত থাকবে। কেননা, আমরা যে ভালবাসা দিয়ে বিশ্বটাকে জয় করতে চাই। ওর একটি মৌলিক গুণ আছে- ও মারাত্মক সাহসী, একেবারে দুর্ধর্ষ সাহসী।

দেখই না সুমোকুস্তির দীর্ঘদিনব্যাপী বিশ্বচ্যাম্পিয়ান দানবাকৃতির কোনিশিকিকে সে কেমন করে মুখ ভেংচে চ্যালেঞ্জ করেছে। ভাবখানা এই "ব্যাটা তোমাকে আমি কুচ পরওয়া নেহি করি।" তোমাদেরকে কিন্তু আমি বলবো না তোমরাও এই বিচ্ছুর মতো রাস্তাঘাটে বড়দের এমন করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারো। বরং তোমাদের আজ বলবো তার চাইতেও একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য। কি বলো, পারবে? কারণ আমি যাদের নিয়ে লিখছি, তাদের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসবে নতুন সহস্রাব্দের আলী, খালিদ, তারেক, মোহাম্মদ ইবনে কাসেম এবং সুমাইয়া, জয়নব, আয়েশা ও ফাতেমা। সুতরাং তাদের অভিধানে অসম্ভব বলতে খুব কম বিষয়ই আছে। যাদের চিঠিতে নীলনদের শুকিয়ে যাওয়া পানি প্রবাহিত হতো, যাদের তাকবীরে পারস্যের অপ্রতিহত স্রোতস্বিনী পরাজিত হতো। যাদের ঘোড়ার খুরের দাপটে পৃথিবী প্রকম্পিত হতো; তারা কি এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছুকে ভয় পেতে পারে? অসম্ভব- এটি হতেই পারে না- হতেই পারে না। তো, থাক এত্তোসব কথা। তোমাদেরকে যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আহ্বান আমি জানাতে চাই সেটি হলো- একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ।

অবশ্য, এ কথাটি বুঝে না বুঝে অনেকেই বলে। এর অর্থ কি? এর অর্থ সংক্ষেপে বলা খুবই কঠিন। তবু চেষ্টা করা যাক, কেমন? সেটি হলো এই আজকে যারা বিশ্বকে শাসন করছে সেই পাশ্চাত্য, তাদের হাতে কোন শক্তিশালী বা সুন্দর আদর্শ নেই। তবু কেন তারা বিশ্বকে শাসন করতে পারছে কারণ তাদের আছে;

১. মানবীয় যোগ্যতা (যেমন ঐক্য, দেশপ্রেম, জ্ঞানস্পৃহা, সাধনা, পর্যালোচনা করা এবং সমালোচনা গ্রহণের মানসিকতা ইত্যাদি)

২. কর্মের দক্ষতা (যেমন পরিশ্রমপ্রিয়তা, নিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি)

৩. প্রযুক্তির শক্তি (যেমন কম্পিউটার, মিডিয়া, কমিউনিকেশন ইত্যাদি)

আর আমাদের হাতে আছে বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী আর সুন্দরতম আদর্শ আল ইসলাম। তবু কেন আমরা পাশ্চাত্যের দ্বারা নির্যাতিত, পর্যুদস্ত- কিংবা কমপক্ষে তাদের মুখাপেক্ষী এর কারণ,

১. আমাদের মানবীয় যোগ্যতা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে বিকশিত হয়নি।

২. আলস্য বা দায়িত্বানুভূতির অভাবে কর্মের দক্ষতা সৃষ্টি হয়নি,

৩. প্রযুক্তির শক্তি (যেমন কম্পিউটার, মিডিয়া, কমিউনিকেশন ইত্যাদি)

নেই বললেই চলে।

ভাইবোনেরা, তোমরা তো জানো আজ প্রযুক্তির উন্নয়ন হচ্ছে রকেটের গতিতে- আর মানবীয় চরিত্র আর ভালোবাসার পতন হচ্ছে উল্কার গতিতে। আজ আকাশছোঁয়া অট্টালিকা হচ্ছে কিন্তু কোন ঘরেই মানসিক প্রশান্তি নেই। মঙ্গলগ্রহের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে কিন্তু নিজের প্রতিবেশি এমনকি নিজের স্বজনদের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। তাই যেমন প্রযুক্তির উন্নয়ন হচ্ছে ব্যাপকভাবে ঠিক তেমনি পাল্লা দিয়ে হতাশা, অশান্তি আর হত্যা, আত্মহত্যার হারও বেড়েছে। এর কারণ একটিই বর্তমান পৃথিবীর শাসকরা বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রতি নজর দিলেও মন ও আত্মার উন্নয়নের দিকে তারা কোনই নজর দেয়নি। তাই অনেকে আক্ষেপ করে বলেন "বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ"। আসলে দোষটা বিজ্ঞান ব্যাটার নয় বরং যারা বিজ্ঞান চর্চা করেছে তাদের। কারণ তারা বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের যোগ করতে পারেনি অথবা দোষটা আমাদের যারা ধর্ম পেয়েছি কিন্তু এর সাথে বিজ্ঞানকে যুক্ত করিনি।

সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ হলো এই-

১. হয়, বিশ্ব প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন সত্ত্বেও হতাশা, মারামারি, হানাহানিতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

২. অথবা, আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে- যাদের হাতে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আদর্শ ইসলাম আছে। যাতে করে আমরা এর সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় এবং তা প্রয়োগ করতে পারি।

সুতরাং আমাদের জন্য একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ হলো ইসলামের শক্তিকে আরো সতেজ করার পাশাপাশি, বিশ্বমানের যোগ্যতা, দক্ষতা আর প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন। যাতে করে আর ধ্বংসোন্মুখ পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী নয়- বরং আমরাই দিতে পারি বিশ্বের নেতৃত্ব। শুধু নেতৃত্ব লাভের জন্যই কি এটা দরকার? না, বরং বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও অনাবিল শান্তির জন্যই এটা দরকার। কি, প্রিয় ভাইবোনেরা তোমরা কি পারবে আজকের বিশ্বের শাসক পাশ্চাত্যের মোকাবেলায় যোগ্যতা অর্জনের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে? হ্যাঁ তোমাদের পারতেই হবে এবং তা এখন থেকেই শুরু করতে হবে। কারণ বিশ্ব আজ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। প্যারাডাইজ লস্টের কবি, মহাকবি মিল্টন

বলছেন: The childhood shows the man as morning shows the day.

এসো আবার তাকাই এই ক্ষুদে সুমো কুস্তিগীরের দিকে, সে যেমন সাহস নিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান কোনিশিকির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে; চ্যালেঞ্জ করেছে; আমরাও ঠিক তেমনি যোগ্যতা অর্জনের যুদ্ধে শক্তিশালী পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করবো না, বরং তাকে হারিয়ে দেব, তাকে চ্যালেঞ্জ করবো সবাই বলো, ইনশাআল্লাহ।

অধিকাংশ সময় একটা সত্য-কৌতুক দিয়ে শুরু করা আমার বদঅভ্যাস। আজকেও তার ব্যতিক্রম করার ইচ্ছে নেই। তবু একটু ব্যতিক্রম, কৌতুকটা হচ্ছে সবার শেষে। আটটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা জাপানের দক্ষিণের দ্বীপ ওকিনাওয়ার নাগো শহরে মিলিত হন। এই আট দেশকে বলা হয় জি এইট (G-8)। তোমাদের মনে রাখার সুবিধার্থে দেশগুলির নাম বলছি- আমেরিকা, জাপান, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী ও রাশিয়া। যদিও গত পাঁচ বছর জাপানে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে তবুও সামিটের আয়োজনে রেকর্ড পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হয়। বৃটেনের টেলিগ্রাফ লিখেছে, এর আগে জি-এইট সামিটে অন্যান্য দেশে যত টাকা ব্যয় করা হয়েছিল জাপান এবার তার পঞ্চাশ গুণ বেশি খরচ করেছে। এ ব্যয়ের পরিমাণ হলো ৮০ বিলিয়ন ইয়েন। অর্থাৎ ৫০০ মিলিয়ন বৃটিশ পাউন্ড। তোমরা জানতে চাও বাংলাদেশী টাকায় কত হতে পারে? প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। এ পরিমান টাকা দিয়ে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির প্রায় সোয়া কোটি শিশুর শিক্ষার খরচ চালানো যেত। এটাও এক ধরনের কৌতূক বটে! যে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের পিছনে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ দরিদ্রশিশুর সার্বিক শিক্ষার ব্যয় এবার চলো ধণাঢ্যতায় হিমালয় সমান সেই জাপানের আরেকটি চিত্র দেখি। সামিটের মাস খানেক আগে জাপানের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মি. মরি গিয়েছিলেন জি এইটের লিডারদের ফর্মাল দাওয়াত এবং যে সব বিষয়ে আলোচনা হবে তার আইডিয়া দিতে। তখন তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এটাই ছিল তার ক্লিনটনের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎকারের আগে মরিকে তার সহযোগীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রথম সাক্ষাতে মরি যেন দু'একটি কথা ইংরেজীতে বলেন। উল্লেখ্য, জাপানের প্রধানমন্ত্রী অন্য কোন দেশের নেতাদের সাথে

কথা বলার সময় সর্বদা দোভাষীর সাহায্য নেন। যাই হোক, মরিকে কয়েকটি ইংরেজি বাক্য শেখানো হয়। আমেরিকায় গিয়ে ক্লিনটনের সাথে দেখা করার সময় মরি প্রথম ইংরেজি বাক্যটিই শুদ্ধ করে বলতে পারেন। তাকে শেখানো হয়েছিল হ্যান্ডশেক করার সময় How are you বলতে। উত্তরে ক্লিনটন বললেন, I am Fine and you? মরি সংক্ষেপে বলবেন Mee too! এ পর্যন্তই। তারপর দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলবেন। তিনি যখন ক্লিনটনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছিলেন তখন মরি বলেন, Who are you (তিনি How ভুলে গিয়ে Who বলে ফেলেন)। বিচক্ষণ ক্লিনটন হেসে উত্তর দেন, I am Husband of Hillary মরিও না বুঝে তোতাপাখির মতো তার শিখানো Mee too! (অর্থাৎ আমিও হিলারীর হাসব্যান্ড) বলাই বাহুল্য, উল্লেখিত দুই নেতার এ আলোচনার কথা হাসতে হাসতে জাপান রেডিও-র একটি ন্যারেটর কৌতুক করে ২২ জুলাই ২০০০ তারিখ সকালে প্রচার করে। মরির অবস্থা দেখে আমরাও মরি! মরি! তবে তার একটি গুণ স্বীকার করতেই হবে, সেই বেরসিক ন্যারেটরের চাকুরী খেয়ে তাকে তিনি জেলে পুরেননি। আমাদের দেশে হলে বেচারার কি যে হতো আল্লাহ্ মালুম। ভুল সবারই হতে পারে কিন্তু এখানেই হলো উন্নত দেশের সাথে আমাদের পার্থক্য।

যে কোন ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার ভোকাবুলারী বা শব্দ ভান্ডার। তারপর শব্দ সাজিয়ে বাক্য তৈরি সেতো তোমাদের জন্য নস্যি! তাই না? তোমরা তো জান কোন কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলে তাতে বরকত হয়। আর সেই বিসমিল্লাহর প্রতীক হচ্ছে ১৯। এবার এসো, আমরাও ইংরেজীতে ভাল কথাবার্তা বলা বাড়ানোর জন্য ১৯টি ম্যাজিক ফর্মূলাই আলোচনা করি।

১. ভোকাবুলারী বাড়ানোর জন্য "জুনিয়র ওয়ার্ড মাস্টার গেম" খেলা যা ঢাকার নীলক্ষেতে পাওয়া যায়।
২. ইংরেজি পত্রিকা পড়ে তার অপরিচিত শব্দগুলি দাগিয়ে রাখা এবং ডিকশনারী থেকে শেখা।
৩. একই সাথে একটি শব্দের নাউন, ভার্ব ও অ্যাডজেক্টটিভ শেখা; খাতার ভিতর সারি সারি করে লিখে শিখলে আরো ভাল হয়।
৪. বিভিন্ন লেখালেখিতে প্রতিনিয়ত নতুন শব্দ লেখা এতে করে বানান

শুদ্ধ হবে।

৫. কমপক্ষে প্রতিদিন ৫টি করে নতুন শব্দ শেখা, যা টুকরো কার্ডে লিখে সর্বদা শার্টের পকেটে রাখা যেতে পারে।

৬. নিয়মিত নিউজ এট টেন এবং বি.বি.সি-এর ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের ইংরেজি খবর শোনা।

৭. বিদেশীদের সাথে কথা বলার সকল সুযোগ কাজে লাগানো।

৮. ব্যক্তিগত সকল কর্মসূচি বা বাজারের তালিকা ইংরেজিতে করা।

৯. কোন ভাল কার্টুন বা প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের ভি.ডি.ও বারবার দেখা।

১০. কিছু ইংরেজি কবিতা, গান বা উদ্ধৃতি মুখস্থ করা এবং কথাবার্তার কাজে লাগানো।

১১. একটি ভোকাবুলারী নোট খাতা বানানো এবং অবসরে পড়া, যেমন বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বা যানজটে পড়ে।

১২. একজন বিদেশী ফ্রেন্ড তৈরি এবং তার সাথে নিয়মিত চিঠি যোগাযোগ করা।

১৩. একটি কমিক বুক বা পিকচার বুক সংগ্রহ করে ইংরেজীতে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা।

১৪. সর্বদাই একটি পকেট ডিকশনারী কাছে রাখার চেষ্টা করা এবং তা কাজে লাগানো।

১৫. প্রায়ই ইংরেজি ভদ্রতাসূচক বাক্যগুলির ব্যবহার করা; যেমন স্যরি, থ্যাঙ্ক ইউ, ওয়েলকাম, হাউ আর ইউ।

১৬. একটি ইংরেজি রেডিও প্রোগ্রাম রেকর্ড করা; তার সংক্ষিপ্ত অংশ শুনে তা বন্ধ করে, নিজে বলার চেষ্টা করা।

১৭. সহজ ইংরেজি গল্পের বইগুলি পড়া।

১৮. নিজের পরিবারের ভিতরে এবং বন্ধুদের নিয়ে একটি গ্রুপ করে স্পোকেনের নিয়মিত চর্চা করা।

১৯. এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট মাসিক পরিকল্পনা নেয়া এবং প্রতিদিন শোয়ার সময় ও সপ্তাহে কমপক্ষে একবার সময় নিয়ে তার পর্যালোচনা করা।

আল্লাহ্ আমাদের বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ইংরেজি ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করার তৌফিক দিন।

এবার তোমাদের তিনটি সহজ কুইজ ধরবো। আশা করি পারবে। কুইজগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. ইংরেজিতে সবচেয়ে বড় অর্থবোধক শব্দটি কি?

২. সবগুলি ইংরেজি বর্ণমালা একে একে ব্যবহার করে একটি অর্থবোধক বাক্য তৈরি করা।

৩. বৃটেনের কোন রানী ভাল ইংরেজি বলতে পারতেন না? এবং কেন?

যে যত ভাষাই পণ্ডিত হোকনা কেন ছোট্টবেলায় মায়ের মুখ থেকে শেখা ভাষাই তার সবচেয়ে আপনভাষা, সবচেয়ে শুদ্ধ ভাষা, যে ভাষায় সে কাঁদে যে ভাষায় হাসে। তোমরা তো জান সেই ১৭৫৭ সালে বৃটিশরা বাংলা দখল করেছিল, কেড়ে নিয়েছিল আমাদের মাতৃভাষা আর ইংরেজিকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল আর আজ আড়াইশ বছরের ব্যবধানে বাংলা হানা দিয়েছে খোদ ইংরেজদের জন্মভূমিতে। শোন ছোট্ট দু'টি সত্য ঘটনা ঃ

এক) রংপুরের সাড়ে ৩ বছরের প্রতিভাবান ছোট্ট মেয়ে মাহজেবিন ইসলাম মৌ; ১ মিঃ ৫ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে ১০৯টি মৌলিক পদার্থের নাম বলতে পারে এর ভিতর হাইড্রোজেন থেকে সর্বশেষ আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থ মিটানেরিয়াম পর্যন্ত আছে।

(দুই) আমার এক ছোট্ট ভাগ্নি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী মুমতাহিনা নূর ছন্দ, কিশোর কণ্ঠের এক পাগলী পাঠক। হাতে পাওয়া মাত্রই হাপুসহুপুস সব গল্পগুলি সাবাড় করে ফেলে। তার পেটে প্রায় একশটির ওপর গল্প আছে। সেদিন আমাকে কাছে পেয়েই সে বন্দি করে ফেললো অতঃপর সারাদিনে শুনিয়ে দিল প্রায় ১৭টির ওপর গল্প। শুধু কি তাই? সে একজন ক্ষুদে কবিও বটে; ফারজানার উপহার দেওয়া প্যাডের ভিতর সে টুকটুক করে লিখে দিল একটি মজার ছড়া-

"ছোট্ট পাখি ছোট্ট পাখি
আমার কাছে আয়না-
তোকে আমি দেব
হাজার টাকার গয়না।"

আমার বিশ্বাস তোমরা সবাই চেষ্টা করলে এর চাইতেও ভালো প্রতিভার পরিচয় দিতে পারবে। এবার চলো আমরা কাজের কথায় চলে আসি। আল্লাহর রাসূল (সা) এক হাদিসে বলেছেন, "তোমরা কি জান চীন দেশ কোনদিকে? ঠিক আমাদের উত্তরে সুবিশাল হিমালয় আর তিব্বত মালভুমিরও উপরে। আচ্ছা এখনই তোমাদের একটি কুইজ ধরি, কি ভয় পেয়ে গেলে? নাহ্ তোমরা তো সাহসী সেনা ভয় পেলে তো চলবে না। আচ্ছা বলো তো চাঁদ থেকে পৃথিবীর কোন স্থাপত্যকর্মটি দেখা যায় এক... দুই... তিন মিনিট– কি পারলে না! তবে শোন সেটি হচ্ছে চীনের মহাপ্রাচীর। সেই চীন দেশের এক যুবক নাম তার লী ইয়াং তিনি যখন লেনযুয়া একাডেমীতে পড়তেন, তখন পরীক্ষায় ইংরেজীতে ফেল করেন। তোমরা হয়তো বলবে এটা আবার একটা ঘটনা হলো? নাহ্ এর পরেই আছে মজার ঘটনা। ফেল করে সে গেল মহাক্ষেপে। এরপর ইংরেজিকে মজা দেখানোর জন্য যার সাথেই দেখা হয় শুধু ইংরেজিতে কথা বলে এমনকি গাছ, ল্যাইটপোস্ট পর্যন্ত তার বিশৃঙ্খল ইংরেজি শোনা থেকে রেহাই পায় না। অনেক অনেকদিন পর আজ তার কি অবস্থা জান? চীনে সে আজ প্রায় ৩০ হাজার মানুষের সরাসরি ইংরেজি শিক্ষক। আর পরোক্ষভাবে তার কাছে শিক্ষা নিয়েছে প্রায় ১০ কোটি ৪০ লক্ষ চীনা নাগরিক।

সুতরাং আমরাও সিরিয়াসলি চেষ্টা করলে এমনটি হতে কেন পারবো না! এসো আমাদের এই অভিযানকে আরো বেগবান করি, শুরু হোক আমাদের বিশ্বজয়ী সাধনা।

Your boss has a bigger vocabulary than you have That's one good reason why he's your boss.

মনোযোগ-সংযোগ

"আমেরিকার একটি শহরে উচ্চতর বিজ্ঞানকেন্দ্রে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে একটি চমৎকার বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। একদিন নিকটবর্তী প্রিন্সটন কলেজে ফোনকরে এক ভদ্রলোক একজন ডীনকে চাইলেন। ডীন ঘরে নেই শুনে তিনি তার সেক্রেটারির কাছে আইনস্টাইনের বাসার ঠিকানাটি জানতে চাইলেন। সেক্রেটারি সবিনয়ে জানালেন, দয়া করে আমাকে মাফ করবেন, ডঃ আইনস্টাইন একটু নিরিবিলি থাকতে চান বলে ঠিকানা কাউকে দেয়া বারণ আছে। টেলিফোনের অপরপ্রান্তের ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ থেকে ফিসফিসিয়ে বললেন, মাফ করবেন! আমি স্বয়ং আইনস্টাইন বলছি, বাসা থেকে

একটু বেড়াতে বের হয়েছিলাম। এখন আমার বাসার ঠিকানাটি একদম ভুলে গেছি।"

চলো আকেরটি গল্প পড়ি–

আজ থেকে প্রায় একশত পাঁচ বৎসর আগে ১৮৯৫ সালে সৈয়দ আব্দুস সামাদ জন্মগ্রহণ করেন। সামাদের আরেকটি ঘটনা রূপকথাকেও যেন হার মানায়। খোদ ফুটবলের জন্মস্থান বৃটেনের লন্ডন স্টেডিয়ামে তিনি খেলেছেন বৃটিশদের বিরুদ্ধে। বেশ দূর থেকে সামাদের একটি শর্ট করা বল বৃটিশ পক্ষের গোলবারে লেগে ফিরে আসলো। কিন্তু সামাদ রেফারীর কাছে চ্যালেঞ্জ করে বসলো যে তোমাদের গোলপোস্ট অবশ্যই কিছুটা নিচু আছে, তাই আমি গোল দাবি করছি। প্রথমে রেফারী তার কথা হেসেই উড়িয়ে দিল, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। অবশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর রেফারী তাচ্ছিল্যের সাথে মেপে দেখলো। কিন্তু একি অবাক কাণ্ড! দেখা যাচ্ছে সামাদের কথাই ঠিক। গোলবারটি প্রায় দেড় ইঞ্চি নিচু। এমতাবস্থায় বাতিল হওয়া গোলটি হিসাবে ধরা হলো। কিন্তু এই ঘটনা তৎকালীন ফুটবল বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলো। এত সূক্ষাতিসূক্ষ্ম হিসাব কিভাবে সম্ভব? বিশ্ব ফুটবলারের ইতিহাসে এমন নির্ভুল শর্ট এবং চ্যালেঞ্জ করার মতো ফুটবলার আজও জন্মায়নি। পাক্কা ছয় ফুট লম্বা এই ফুটবলের যাদুকর সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি ছড়িয়ে আছে সেই ছোট্ট বেলা থেকেই তিনি নাকি একটি টেনিসবল নিয়ে ডিবলিং করতে করতে সর্বত্র, মাঠে-ঘাটে যেতেন। এমনকি এমতাবস্থায় বাজার থেকেও ঘরে আসতেন। এভাবেই বলের ওপর তার চুম্বকের মতো প্রভাব তৈরি হয়েছিল। বল যেন তার পায়ে আঠার মতোই লেগে থাকতো। তিনি যেন সেই ইংরেজি প্রবাদটিই নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছিলেন Practice makes a man perfect. আইনস্টাইনের কৌতুক থেকে আমরা শিক্ষা পাই একজন অতিমেধাবী লোকও যদি একটি সাধারণ বিষয়কে গুরুত্ব না দেয় তবে সেটি তার মনে নাও থাকতে পারে। অপরদিকে ফুটবলের যাদুকর সামাদের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা পাই একটি জটিল বিষয়কেও যদি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়, বারবার চর্চা করা হয় তবে তা জলবৎ তরলং হয়ে যায় এ দু'টি বিষয়কে সামনে রাখলে আমরা মূলত একটি বিষয়ের গুরুত্বকেই খুঁজে পাই সেটি হচ্ছে "মনোযোগ"।

তোমরা জান কি স্মরণশক্তি বা মেধা নামক গুপ্তধনের গোপন চাবিটি কি? একটু চোখ বন্ধ করে ধ্যান করেই বলো না, কী পারছো না, চিচিংফাক?

আরে সেতো আলী বাবা আর চল্লিশ চোরের ঘটনা। আসলে বিষয়টি কিন্তু আমরা একটু আগেই বলে দিয়েছি, কি এখন ধরতে পেরেছো? হ্যাঁ সেটি হচ্ছে-মনোযোগ। 'ইউজ ইউর মেমোরী' নামক গ্রন্থে লেখক বলেছেন **"মানব মস্তিষ্ক তথ্যে ভারাক্রান্ত হওয়া অসম্ভব, মানব মস্তিষ্ক প্রতি সেকেন্ডে দশটির উপর ভিন্ন ভিন্ন আইটেম ধারণে সক্ষম।"** তা সত্ত্বেও আমাদের স্মৃতি বিভ্রাটের কারণ কি, কেন মনে থাকে না? এর কারণ হচ্ছে হয়তো গুরুত্বহীনভাবে আমরা তথ্যগুলি গ্রহণ করেছি। হয়তো সে সময় আমরা অন্যমনস্ক ছিলাম বা অন্যকোন কাজে ব্যস্ত ছিলাম অথবা তড়িৎ গতিতে কাজটি করা হয়েছে সে জন্য তথ্যগুলি মস্তিষ্কের তথ্যব্যাংকে ঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি। উপরোক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে "ব্যতিক্রমী দু'একজন ছাড়া বাকী সবার স্মৃতিশক্তি প্রায় একই।" একটি মজার কথা বলছি তোমরা এক্কেবারে থ বনে যাবে না তো? তাহলে বলছি শোন, তোমাদের স্মৃতিশক্তি আইনস্টাইন, নিউটন, আর সক্রেটিসের তুলনায় কোন অংশেই কম নয় তোমরা ভাবছো বেচারার মাথাটাই শেষতক তালগোল পাকিয়ে গেল কিনা? সত্যি বলছি, আমার মাথাটি একদম ঠিক আছে, আর কথাটি ঐ বিখ্যাত বই 'ইউজ ইউর মেমোরী'-এর বক্তব্য। আসল ঘটনা হচ্ছে সবই মনোযোগের খেলা। আইনস্টাইন নিজের বাসার নাম্বারটিও মনে রাখতে পারেননি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব ও মনোযোগ দেননি বলে। তেমনি আমরা যা পারি না তা এই মনোযোগের অভাবের কারণেই। এই মনোযোগ কাকে বলে? সাধারণ অর্থে 'কোন বিশেষ বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে মনোনিবেশ করাই মনোযোগ'। যেমন আমাদের প্রিয় খেলা ক্রিকেটের কথাই ধরা যাক। যখন ওয়াসিম আকরাম বল করছে তখন আমাদের নজর থাকে শুধুমাত্র তার দিকেই, এরপর হয়তো প্রতিপক্ষের টেন্ডুলকারের ব্যাটের দিকে; অতঃপর বলটি যেদিকে ছুটে যায় সেদিকে। তখন কিন্তু অন্যান্য খেলোয়াড়দের প্রতি আমাদের তেমন নজর থাকে না যার ফলে ঠিক তখন তারা কে কি করছে আমরা বলতে পারবো না। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গিলফোর্ড বলেন, **"মানুষ যা প্রত্যক্ষ করতে চলেছে তা নির্বাচন করার প্রক্রিয়াকেই মনোযোগ বলা হয়।"** তোমাদের কী সেইসব গোপন ফর্মূলা বলে দেব যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের সেই কাংখিত স্মরণশক্তির গুপ্তধনকে উদ্ধার করতে পারবে? কি বলবো? হ্যাঁ বলতে পারি, তবে তার আগে কথা দিতে হবে এ ফর্মূলায় লেখাপড়া করে যদি তোমাদের রেজাল্ট ভাল হয় তবে কিন্তু আমাকে ফুলপেট মিষ্টি খাওয়াতে হবে। কি ঠিক তো? তাহলে এক এক করে বলছি শোন।

১. উজ্জ্বলতা সাধারণের ভিতর একটি উজ্জ্বল জিনিস আমাদের মনোযোগ কাড়ে। সুতরাং আমাদের উচিত বই বা নোটের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ রঙিন মার্কার দিয়ে দাগিয়ে পড়া।
২. বিচ্ছিন্নতা অনেক মানুষের ভীড়ে আলাদা একজনের প্রতি নজর পড়ে। ঠিক তদ্রূপ কোন নোটের মৌলিক পয়েন্টগুলি আলাদা করে ডান পাশে লিখলে সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে।
৩. ব্যবহার একটি বিষয় ব্যবহার করলে তা সহজেই মনে থাকে। যেমন একটি মটর গাড়ির ইঞ্জিনিয়ারের চাইতে একজন সার্টিফিকেট ছাড়া মেকার মটরগাড়ির মেরামতের কাজ ভাল বুঝে। সুতরাং পড়া একটি বিষয়কে বারবার চর্চা এবং লেখার মাধ্যমে প্রয়োগ করলে তা সহজেই মনে থাকে।

ভাল রেজাল্ট করতে হলে

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি নাট্যকার এবং হাস্যরসিক মঁলিয়্যার [১৬২২-১৬৭৩] একবার সেরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে গল্প শোনাচ্ছিলেন। গল্পটা এ রকম "এক গন্ডমূর্খ ধনী জমিদার প্যারিস থেকে অল্পদিনের জন্য গ্রামের বাড়িতে এসেছেন। নিজের প্রিয় ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তিনি গ্রামে বেড়াতে বের হয়েছেন। রাস্তার ধারে এক নতুন বাড়ি দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। সেখানে অনেক ছেলেমেয়ের ভীড় দেখে তার কৌতূহল হলো। একজন ছেলেকে ডেকে তিনি রাজকীয় গাম্ভীর্যে জিজ্ঞেস করলেন 'এখানে কী হচ্ছে?'
ছেলেটা বললো– এটা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে হাজার ফ্রা (ফরাসী মুদ্রা) জমা দিলে পিএইচ.ডি ডিগ্রি পাওয়া যায় যারা হাতে বা পায়ের বুড়ো আঙুলে কোনমতে টিপছাপ দিতে পারে তারা এক হাজার ফ্রা জমা দিলেই ডিগ্রী পেয়ে যায় জমিদার তো বেজায় খুশি হয়ে ভেতরে গেলেন। কড়কড়ে এক হাজার ফ্রা জমা দিয়ে ভিসির কাছ থেকে টিপছাপ দিয়ে ডিগ্রী নিয়ে এলেন। বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ তার মনে হলো হায়! আমি কি বোকা, আমার ঘোড়ার জন্যও তো একটি ডিগ্রী আনতে পারতাম। যেই ভাবা সেই কাজ, ফিরে গিয়ে ভিসিকে বললেন, 'এই নিন আরো এক হাজার ফ্রা, আমার ঘোড়া আশা করি অন্তত পায়ে টিপছাপ দিতে পারবে, সুতরাং তাকেও একটি ডিগ্রী দিন'। কিছুক্ষণ জমিদারের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে ভিসি বললেন, 'স্যরি, আমরা শুধুমাত্র গাধাদের ডক্টরেট দিয়ে থাকি, ঘোড়াদের দিই না।'
তোমাদের এক ভূবনবিজয়ী হাসিমাখা অথচ প্রতিভাদীপ্ত ক্ষুদে মুজাহিদের

সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি; হস্ত লেখা প্রতিযোগিতায় সে পরপর কয়েক বছর তার গ্রুপে জেলা চ্যাম্পিয়ন। সাইক্লিং, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট প্রভৃতিতে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমবয়সীরা তো বটেই বড়রা পর্যন্ত ভয় পায়। বইয়ের সাথে তার সম্পর্কটা চুম্বকের মতোই শক্তিশালী, তার বই পড়ার স্টাইল দেখলেই কেবল তোমরা বুঝতে। নাম তার যোবায়ের, হ্যাঁ, রাসূল (সা) এর ফুফাতো ভাই সাহাবা যোবায়ের (রা)-এর সে মিতা। আর তাই তো নামাজ কাজা হওয়া তো দূরের কথা বরং প্রতিমাসে তার কম ওয়াক্ত নামাজই জামায়াত ছাড়া পড়া হয়। এই বয়সেই তার আঠারোটি সূরা মুখস্থ আর তেলাওয়াতটা এতই সহী যে বড়রাও তার সামনে ইমামতি করতে ভয় পায়, পাছে কখন ইচড়ে পাকার মতো লোকমা দিয়ে বসে। তোমরা হয়তো টিপ্পনী কেটে বলছো; হবে না, তার তো লেখাপড়া নিয়ে আমাদের মতো এত টেনশন নেই। তবে শুনই না সে অধ্যায়ের কাহিনী। সে তৃতীয় শ্রেণীর ফাস্টবয়, যদিও তার ক্লাসের সেকেন্ড বয়ের নামও যোবায়ের। কিন্তু উভয়ের প্রতি বছরের মার্কের পার্থক্য বেশ বড় রকমের, অর্থাৎ স্কুলজীবনের শুরু থেকেই বলা যায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ওহ, ভাল কথা– সে একজন ক্ষুদে কবিও বটে, তার তিন মাসের আদরের ছোট্ট বোনকে নিয়ে সে একটি ছড়া লিখেছে, মজার সেই ছড়াটি তোমাদের বলতে, লোভ সালাতে পারছি না ঃ

ছোট্ট বাবু তুলিমণি
সবাই ডাকে টুলিমণি;
সব সময় ভাল থাকে
রেগে গেলেই, জোরসে কাঁদে।
মাঝে মাঝে ভালো হয়ে যায়
তখনই সে আদর পায়,
ঘুমের মধ্যেও থাকে হাঁসি
মাঝে মাঝে দেয় হাঁচি।

যোবায়ের

সুপ্রিয় ভাইবোনেরা তোমরা কি বুঝতে পেরেছো কৌতুক এবং যোবায়েরের কাহিনীটি তোমাদের বলার মতলবটা কি? মতলব হচ্ছে তোমাদের সামনে এই সত্যটা তুলে ধরা যে, আমাদের সমাজের কিছু লোক আছে যারা যোগ্যতা অর্জন ছাড়াই সেই মূর্খ জমিদারের মতো শুধু সার্টিফিকেট অর্জন করতে চায়, আমাদের তাদের মতো হলে চলবে না এবং এর পাশাপাশি আমাদের ছোট্টবেলা থেকেই ক্ষুদে যোবায়ের এর মতো বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের দিকে নজর রাখতে হবে।

প্রচণ্ড জিনিয়াস বা স্মরণশক্তিসম্পন্নদের নিয়ে টানা দশ বৎসর সিরিয়াস গবেষণা করেছেন আমেরিকার এক্সেটার ইউনির্ভাসিটির প্রফেসর মাইকেল হাও। এ বিষয়ের ওপর তিনি তার অবদানের জন্য পিএইচডি ডিগ্রীও পেয়েছেন। তিনি কিছু মারাত্মক কথা বলে সারা বিশ্বে ঝড় তুলেছেন সেগুলি হলো **"সাধারণ মানুষ ও জিনিয়াসদের ভিতর কোন পার্থক্য নেই।"** তার মতে জিনিয়াসরা প্রত্যেকেই তৈরি হয়, পরিস্কার কথায় তারা ধীরে ধীরে নিজেরাই নিজেদের তৈরি করে নেন। তবে এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের ওপর তিনি খুবই গুরুত্ব দেন, সেটি হলো পারিবারিক শান্তি। যে পরিবারে যত বেশি শান্তি আছে এবং যেখানে ছোট ছেলেমেয়েরা যতবেশি হাসিখুশি পরিবেশের মধ্যে বড় হতে পারে সে পরিবার থেকে ততবেশি জিনিয়াস জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ ক্ষেত্রে জীবনসঙ্গীর অনুপ্রেরণাও অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেছেন, পৃথিবীতে যারাই বড় কাজ করেন তার সব ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কেউ অলৌকিক শক্তির বলে কিছু করেন না। সব কিছুরই বাস্তব কারণ আছে। প্রফেসর হাও ব্রিলিয়ান্ট সাইন্টিফিক মাইন্ড নিয়েও কাজ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখেই নিউটন তার থিউরী পেয়ে যাননি বরং এর আগে নিউটন ঘন্টার পর ঘন্টা জ্যামিতির বিভিন্ন জটিল বিষয় গবেষণা করেছেন। যখন তিনি আপেলটি পড়তে দেখেন তার কাছে একটি সমস্যা পরিস্কার হয়ে যায়।" আইনস্টাইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তার পরিবারের পরিবেশ ভাল ছিল এবং সেখান থেকে তিনি প্রচুর উৎসাহ পান যা তাকে জগৎবিখ্যাত হতে সহায়তা করে। প্রফেসর হাওএর মতে একজন মানুষের সাফল্যের মূল বিষয় হচ্ছে **"ব্যক্তিগত পরিশ্রম, কাজ করার সুযোগ, পারিবারিক উৎসাহ এবং শান্তি।"** তিনি আরো জোর দিয়ে

বলেন পরিবারে টাকার চেয়ে শান্তির বেশি প্রয়োজন। এ কারণে সবারই উচিত পরিবারে দিকে লক্ষ্য রাখা। হয়তো এ কারণেই আমাদের দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, 'যে সংসার চালাতে জানে সে দেশও চালাতে জানে'। প্রফেসর হাও তার নিজের লেখা বই 'হাউ টু বি এ ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস ইন টেন ইজি স্টোজেস,' 'গিভ ইউর চাইল্ড এ বেটার স্টার্ট', জিনিয়াস এক্সপ্লেইড এগুলিতে তিনি আরো বিস্তারিতভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন। যা আমাদের তো বটেই, আমাদের পিতামাতা ও শিক্ষকদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের অনেকেরই তো বেশ আগেই এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমরা শুনতে পারি কী এখন তোমাদের সময় কিভাবে কাটছে? এই শোন, তোমাদের এখনকার সময়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে তোমাদের দরকার নটরডেম, ঢাকা, হলিক্রস এবং লালমাটিয়া কলেজের মতো একটি ভাল কলেজে ভর্তি হওয়া। আর জেলা পর্যায়ে সবচাইতে ভাল কলেজকেই টার্গেট করা। আর ভাষাগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ করে ইংরেজির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আর সামনে যাদের এইচএসসি ও আলীম, ফাজিল, কামিল পরীক্ষা চলছে, এটি ছুঁয়ে দেখার সময়টা পর্যন্ত তাদের নেই। তবুও তোমরা সেইসব ভাই-বোনদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পারো যে এই লেখাটি পড়লে তাদের চলমান পরীক্ষাতেও বেশ লাভ হবে। তাই মূলত টিপস আকারে তাদের পরীক্ষার দিনগুলির জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। পরীক্ষার দিনের জন্য তোমাদের কিছু মৌলিক টিপস দিচ্ছি ঃ

১. পূর্ণ বিশ্রাম, ভাল খাবার, গোসল করে সুন্দর কাপড় পরে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া যাতে মানসিক আনন্দ থাকে। কারণ মন অস্থির হলে অনেক জানা বিষয় লেখা যায় না।

২. Admit Card, কমপক্ষে তিনটি ভাল কলম, ২টি দুই কালারের মার্কার পেন যেমন প্রয়োজন তেমনি জ্যামিতি বক্স গুছিয়ে নেয়া দরকার।

৩. হলে যাওয়ার পূর্বের তিন চার ঘন্টায় মুখস্থ উত্তরগুলোর শুধু Sub point চোখ বুলানো।

৪. আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে হলে যাওয়া।

৫. প্রশ্ন পাওয়ার পূর্বে খাতাটা ভাঁজ করে সুন্দর করে সাজানো।

৬. প্রশ্ন পাওয়ার পর মনোযোগ দিয়ে কমপক্ষে ২ বার প্রশ্নটা আগাগোড়া

ভাল করে পড়ে বুঝে নেয়া, হাতে পেয়েই লেখা শুরু না করা। এবং সম্ভাব্য উত্তর দেয়ার জন্য বাছাই করা।

৭. প্রতিটি উত্তরের জন্য প্রশ্নের পাশাপাশি সময় ভাগ করে লিখে ফেলা এবং যেগুলোর উত্তর দেয়ার ইচ্ছা তা সহজ থেকে কঠিন এভাবে সিরিয়াল করে সেভাবে উত্তর লেখা। যেমন প্রশ্ন পড়ার জন্য ১০.০০-১০.১০ মিঃ

১নং প্রশ্নের উত্তর -১০.১০-১০.৪০ মিঃ

২নং প্রশ্নের উত্তর ১০.৪০-১১.১০ মিঃ ইত্যাদি।

৮. রিভিশনের জন্য কমপক্ষে ২০ মিঃ সময় হাতে রাখা, রিভিশন দেয়া, প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা এবং দুই কালারের কলম দিয়ে প্রয়োজনীয় আন্ডার লাইন করা।

৯. এরপর আল্লাহর কাছে শুধু দোয়া আর দোয়া, কারণ আল্লাহ্ সবই করতে পারেন। আর তার প্রিয় বান্দাদের সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা তো তিনিই করেছেন।

বন্ধুরা আত্মউন্নয়নের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস নিয়ে আমরা সবাই গেয়ে উঠি আমাদের জাতীয় কবির কিছু বলিষ্ঠ উচ্চারণ;

রইব নাকো বদ্ধ খাঁচায়, দেখব এবার ভুবন ঘুরে–
আকাশ-বাতাস চন্দ্র-তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে–
দশ দিকেতে পড়বো লুটে;
পাতাল ছেড়ে নামব নিচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

আমাদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস

বক্তা হিসাবে মার্কটোয়েন তখনও বিখ্যাত হননি। স্টেজে দাঁড়িয়ে লোকদের মনোমুগ্ধকরার মতো যাদুকরী কলাকৌশল তখনও তিনি রপ্ত করতে পারেননি। সেই সময় দূরে এক শহর হতে তিনি বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ পেলেন। শহরের শ্রোতাদের একটি বদনাম ছিল কেউ ভাল বক্তৃতা দিতে না পারলে তারা পঁচা ডিম ছুড়তো। মার্কটোয়েন তাই লোকদের হালচাল বুঝতে ভয়ে ভয়ে বাজারে গেলেন। সেখানে এক দোকানীকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'মশাই শহরে নাকি আজ এক

নামজাদা বক্তা বক্তৃতা রাখবেন?
দোকানী তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললো- শুনেছি বটে, তবে বক্তাকে আমি চিনি না বা তার নাম কি তাও আমি জানি না। মার্ক আশ্চর্য হয়ে বললো- সেকি! আপনার খদ্দেররাও কি তার নাম জানে না। দোকানী এবার যেন একটু মনোযোগী হয়ে বললো- হ্যাঁ, বোধহয় তারা জানে, আর তাই তো যারা আজ টাউন হলে বক্তৃতা শুনতে যাবে তারা আমার দোকানের সব পঁচা ডিমগুলি কিনে নিয়ে গেছে। মার্ক রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে বললো- কেন? কেন? দোকানী মুচকী হেসে বললো- কেন আবার- ভালো বক্তৃতা দিতে না পারলে বক্তার চেহারা রাঙিয়ে দেয়ার জন্য।
সেদিন মার্ক তার ভাগে ঠিক কতটি পঁচা ডিম পেয়েছিল জানা যায়নি (এটা কেউ বলে নাকি?) তবে সেদিনের শিক্ষা নিয়ে সে উত্তরকালে একজন জগৎবিখ্যাত বক্তা হতে পেরেছিলেন।
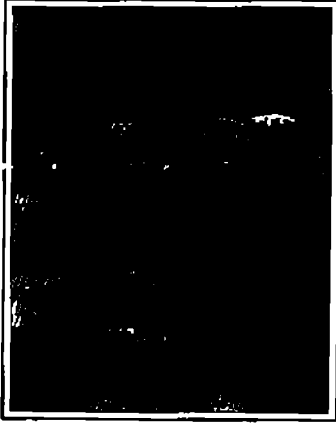
শেরে বাংলা
এ. কে. ফজলুল হক

এসো তোমাদের সাথে এখন পরিচয় করিয়ে দেই এক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সাথে। কি ভড়কে গেলে নাকি? ভাবছো, এটা কি সত্যিই সুন্দরবনের বিশ্ববিখ্যাত ভয়াল দর্শনের সেই বাঘ! ওরে বাপরে! কখন না জানি হালুম করে বসে। ওহ! স্যরি, আমি যাদের নিয়ে লিখছি তারা তো ভড়কে যাওয়ার মতো কেউ নয়। আর গিয়ে, এই রয়েল বেঙ্গল ভয়ালদর্শনীয় কোন জন্তুও নয় বরং অনিন্দ্য সুন্দর এক মানুষ। তার

নামটি জানার আগে চলো তার কৈশরের এক মজার কাহিনী শুনি। "গ্রামের স্কুলের সে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, বয়স কতইবা পাঁচ বৎসরের এক অবুঝ শিশু। পাঠশালায় যেই ওস্তাদ কোন পড়া দিতেন অমনি সে তা চট করে মুখস্থ করে ফেলতো। আর ওস্তাদকে গিয়ে বলতো, স্যার পড়া শেষ হয়ে গেছে আরো বেশি পড়া দেন। ওস্তাদ তাজ্জব হয়ে বলতেন একি! তুমি এতো তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে ফেলেছো, কিন্তু তোমার সঙ্গীরা তো এখনও পারেনি। বালকটি চট করে উত্তর দিত 'ওরা না পারলে আমি কী করব? ওদের জন্য কি আমিও বসে থাকবো? আমি একাই বইটি পড়ে শেষ করে ফেলবো। ওস্তাদ অবাক হয়ে বলতেন, কিন্তু বই শেষ করার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন বাপু? বালকটি বলতো বাঃ রে! এই বইটি শেষ না হলে আব্বু নতুন বই কিনে দেবে না যে। আমার যে আরো নতুন বই চাই। নতুন নতুন বই পড়া চাই। ক্লাসে বরাবরই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। বলো তো এবার তার নামটা কী? মনে হয় চিনতে পারোনি। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার তার তরুণ বয়সের একটি কাহিনী বলবো। এলাকায় থাকতো মস্তবড় এক কাবলী জোয়ান। গায়ে অসুরের শক্তি। পাঞ্জায় গ্রামের কোন যুবকই তার সাথে পেরে উঠছে না। মান ইজ্জতের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে গ্রামের সকল ছেলে সেই তরুণ নওজোয়ানকে ধরলো। এমন পরাজয়ের কাহিনী শুনে সে তরুণের গায়ের রক্ত টগবগ করে উঠলো। গর্জে উঠলো সে কী! এত বড় অপমান, চল দেখি কে ব্যাটা পাহলোয়ান! কোথাকার কোন কাবলীওয়ালা। ওকে দেখাবো মজা। শুরু হলো এবার পাঞ্জা লড়াই। মিনিট না যেতেই কাবলী জোয়ান চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলো। সেই তরুণটি এমন শক্তভাবে ওর আঙ্গুল চেপে ধরলো যে এবার কাবলীর আঙ্গুল ফেটে রক্ত বেরুতে থাকলো। অসহ্য যন্ত্রণায় বেচারা মরণ চিৎকার দিয়ে বসলো। ওর অসহায় অবস্থা দেখে হাত ছেড়ে দিল বাঙ্গালী তরুণ আর কাবলী পালাতে পালাতে চিৎকার করে বললো, "বাঙ্গাল মে ভী কাবলী জোয়ান হ্যায়"। কি এখনও চিনতে পারোনি? মনে হয় অনেকে চিনে ফেলেছো। আচ্ছা এবার তার যুবক বয়সের একটি ঘটনা বলছি, ১৮৯৫ সালের কথা যুবক ইংরেজিতে এম.এ পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মাত্র ছ'মাস পরেই পরীক্ষা। আর ঘুরাঘুরি নয়, দাবাখেলা নয়। শুরু করেছেন পড়াশুনার লড়াই। হঠাৎ এক ঘনিষ্ঠ হিন্দু বন্ধু এসে হাজির। আর এসেই খোঁচা দিয়ে

বন্ধুটি যুবককে বললো–কী অংকের ভয়ে বুঝি ইংরেজি নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছ?–তার মানে? বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে চাইলো যুবক, চোখেমুখে তার বিস্ময় কী বলতে চাইছো তুমি?
আগত বন্ধুটি বললো–না, বলছিলাম কি, মুসলিম ছাত্রদের তো একটি দুর্নাম আছে।
– কি দুর্নাম?
– তারা কোন মগজের কাজে নেই। তারা অঙ্কে ভয় পায়। অঙ্ক নাকি তাদের মাথায় ঢোকে না।
–কী বললে তুমি? মুসলিম ছাত্ররা অঙ্ক দেখে ভয় পায়? সহসা যেন বাঘের মতোই গর্জেই উঠলো যুবকটি।
–নয়তো কী! আগত বন্ধুটি বললো, অঙ্ক দেখে ভয় পাও বলেই তো শুধু মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে ইংরেজি পরীক্ষা দিচ্ছ। যদি অঙ্ক নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারতে তবে না হয় বুঝতাম তোমার মাথার জোর।
– ঠিক আছে, তা-ই হবে। যুবকটি সজোরে টেবিলে মুষ্টাঘাত করে বলে উঠলো, আমি আগে অঙ্ক পরীক্ষাই দেব। মুসলিম ছেলেরা যে ভয় পায় না তা দেখিয়ে দেব।
যেই কথা সেই কাজ। 'মরদ কা বাত হাতিকা দাঁত।' তেজস্বী যুবকটি জেদ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশাল পারমিশন নিয়ে মাত্র ছ'মাসের প্রস্তুতিতেই অঙ্কে রেকর্ড সংখ্যক নাম্বার নিয়ে এম এ পাস করলো। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলো। ইতোমধ্যেই হয়তো সবাই বুঝে গেছ আমরা কাকে নিয়ে আলোচনা করছি। ১৯৬২ সালে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সাড়ে ৮৮ বছর বয়সে। এবার নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে জলবৎ তরলং পরিস্কার হয়ে গেছে আমরা কার কথা বললাম। হ্যাঁ, তিনি আমাদের সবার পরিচিত সবার গর্বের শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক।
তোমাদের কাছে উপরের কৌতুকটি এবং শেরেবাংলার এ কাহিনীটি বলার উদ্দেশ্য কি জান? কৌতুক থেকে আমরা শিক্ষা নেব, কোন ক্ষেত্রে একজন দুর্বল মানুষও যদি সে বিষয়টি নিয়ে সিরিয়াসলি চেষ্টা করে তবে সে ঐ বিষয়ে ঈর্ষণীয় সফলতা অর্জন করতে পারে। আর শেরে বাংলার ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই প্রচণ্ড সাহস আর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো মানসিকতা থাকলে মানুষ বড় ধরনের বাধাও টপকাতে পারে।

তবে এখানে আরেকটি প্রশ্ন আমাদের মাঝে তৈরি হয় শেরেবাংলাকে করা হিন্দু বন্ধুটির প্রশ্ন থেকে, সত্যিই কি মুসলিমরা জ্ঞানবিজ্ঞান আর বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে অপরাপর জাতির তুলনায় পশ্চাদপদ ছিল? বিশেষ করে অন্যান্য জাতি যখন শুধু মঙ্গল নয় বরং মহা মহা অভিযান করে মহাবিশ্ব থৈ থৈ করে ফেলছে তখন জ্ঞানবিজ্ঞানে মুসলিমদের করুণ অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই নব প্রজন্মের হৃদয়ে প্রশ্নটি তীরের ফলার মতোই বিঁধছে। আর আমিও আমার লেখাতে বেশি বেশি আধুনিক সময়ের মানুষের (যারা বেশিরভাগই অমুসলিম) উদাহরণ দেয়ায় ছোট্টমণি পাঠকদের কাছে স্বভাবতঃই ধারণা হয়েছে হয়তো সত্যিই মুসলিমদের ভিতর প্রেরণাদানকারী মনীষীর সংখ্যা খুবই কম। তাই বিবেকের তাগিদেই এমন কিছু উজ্জ্বল মুসলিম জ্যোতিষ্কের উদাহরণ তোমাদের সামনে পেশ করতে চাই। তবে জেনে রাখ তাদের অবদান শত শত বই লিখেও শেষ করা যাবে না।

আর আমরা শুধুমাত্র তাদের জ্ঞানার্জনের সাধনা নিয়েই সামান্য কিছু লিখছি। পরবর্তীতে তাদের অবদান নিয়ে ফাঁকে ফাঁকে লেখার ইচ্ছা থাকলো ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু হানিফার দাদা ছিলেন একজন ইরানী ক্রীতদাস। তার পিতা একজন সামান্য কাপড়ের ব্যবসায়ী থেকে একজন সওদাগরে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি তার পুত্রের মেধাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তাই তাকে ব্যবসায়ে না লাগিয়ে উচ্চ শিক্ষাদানে মনোযোগী হন। আবু হানিফা অল্প বয়সেই কুরআনে হাফেজ হন। আরবি ভাষা-সাহিত্যে তার ছিল অসামান্য দখল। তিনি জ্ঞানের তুলনায় ধনসম্পদ বা পদবীকে কোনই গুরুত্ব দিতেন না। তাই তার সুনাম শুনে কুফা নগরীর স্বেচ্ছাচারী গভর্নর ইবনে হুরায়রা তাকে কুফার কাজীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু জ্ঞানের পাগল আবু হানিফা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। কোনভাবেই রাজি করাতে না পেরে অবশেষে সেই বর্বর গভর্নর তাকে বেঁধে বেত মারার আদেশ দেন। কথিত আছে এগার দিন ধরে প্রত্যহ দশ ঘা করে দোররা মেরেও তাকে রাজি করানো যায়নি। তবে দাম্ভিক খলিফা আল মনসুর তাকে ক্ষমা করেনি। আবু হানিফার অপরাধ ছির তার নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা। তিনি মানুষের ওপর খলিফার জুলুম এবং তার অনৈসলামিক কাজের সমালোচনা করতেন। এই অপরাধে আল মনসুর তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং বিষ

প্রয়োগে হত্যা করেন। জনসাধারণ তাকে এতই সম্মানের চোখে দেখতো যে, তার মৃত্যুর পর প্রায় দশ দিন ধরে তার জানাজার নামাজ হয়েছিল এবং প্রত্যেকদিন গড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক এই নামাজে শামিল হতো। ইমাম আবু হানিফা মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স বা ব্যবহার শাস্ত্রের জন্মদাতা। তার শিষ্যদের ভিতর মুহাম্মদ, আবু ইউসুফ ও জাফরের নাম আজ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই মশহুর শিষ্যত্রয়সহ চল্লিশজন শিষ্য নিয়ে আবু হানিফা একটি কমিটি গঠন করেন, মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর সাধনা করে মুসলিম আইন মহাকোষ গঠন করেন। 'এই সাধনায় বিমুগ্ধ হয়ে মশহুর জার্মান পণ্ডিত ভনক্রেমার বলেছেন, **'এটি ইসলামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধির ধারণাতীত ফল।'**

অপরদিকে ফিহ্‌রিস্ত নামক বিখ্যাত গ্রন্থসূচি প্রণেতা মোহাম্মদ ইবনে নাদিমের মতে জাবির ইবনে হাইয়ান দুই হাজারেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শুধু চিকিৎসা-বিষয়কই তার পাঁচশ' গ্রন্থ ছিল। আর বিজ্ঞানের ওপর তার সমসংখ্যক বই ছিল যার ভিতর একখানি ছিল দুই হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত। চৌদ্দশত আঠারো শতক পর্যন্ত তার লিখিত গ্রন্থগুলি ইউরোপ ও এশিয়ার বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিমিয়া বা রসায়নের ওপরই তার একশত গ্রন্থের সন্ধান মেলে। আর তাই তাকে রসায়ন শাস্ত্রের জন্মদাতা বলা হয়। তিনি জ্ঞানের জন্য এতটাই পাগলপারা ছিলেন যে বলিষ্ঠভাবে বলেছেন, **"আমার ধনদৌলত, টাকাকড়ি আমার ছেলেরা, ভাইয়েরা ভাগ করে নিয়ে ভোগ করবে। কিন্তু জ্ঞানের দরজায় বারবার আঘাত করে আমি যে শিক্ষা দিয়ে গেলাম, তাই আমার তাজ হিসাবে চিরকাল শোভা পাবে।"**

আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনের শাসনকালকে মুসলিম জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য দেশ বিদেশের মশহুর চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, কবি, আইনজীবী, মুহাদ্দেস, তাফসিরকারকদের নিজের দরবারে জড়ো করেন। অতঃপর তাদের নিয়ে দারুল হিকমা তথা বিজ্ঞান নগরী প্রতিষ্ঠিত করে তাদের গবেষণার সর্বাধিক সুযোগ ও পরিবেশ দান করেন। আল মামুন তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় হিব্রু ও গ্রীক জ্ঞানভাণ্ডারকে উজাড় করে আরবিতে অনুবাদ ও রূপায়ণ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ঠিক এমন এক প্রেক্ষাপটেই ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে মুসা আল খারিজ্‌মী জন্মগ্রহণ করেন। যার সিদ্ধান্তগুলি মধ্যযুগের

গণিতশাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার পিতা প্রথম জীবনে একজন ডাকাত ছিলেন, তিনি খোরসানের সড়কে রাহাজানি করে বেড়াতেন। অতঃপর তার মানসিকতার পরিবর্তন হয় এবং বাগদাদে একমনে জ্ঞানচর্চা করেন। তারই তিন পুত্র মুহাম্মদ, আহম্মদ, আর হাসান আরব বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। সেই সময়েই তাদের বাড়িতে একটি নিজস্ব গবেষণাগার ছিল এবং তারা সেখানে দিনরাত জ্যোতিশশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা চালাতেন। এদের ভিতর মুহাম্মদ তথা মুসা আল খারিজ্মী সর্বাধিক মেধাবী ছিলেন। তিনি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শুধু আরবী নয় বরং হিব্রু, গ্রীক ও সংস্কৃতি ভাষারও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একাধারে ভৌগোলিক, জ্যোতির্বিদ, গাণিতিক ও দার্শনিক ছিলেন। আল মামুনের প্রচেষ্টায় তিনিসহ সত্তরজন ভু-তত্ত্ববিদ মিলে 'সুরত আল আরদ' বা পৃথিবীর প্রথম গ্লোব তৈরি করেন। এটাই পরবর্তীতে পৃথিবীর মানচিত্র অংকনে মডেল হিসাবে গৃহীত হয়। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে খারিজ্মীই আজকের বীজগণিতের জনক।

সুপ্রিয় বন্ধুরা, আল কুরআনের পরই সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থটির নাম তোমরা জান কি? হয়তো একগাল হেসে বলবে আরে, এটি তো বুখারী শরীফ। হ্যাঁ, এখন তারই রচয়িতা ইমাম বুখারীর কথা বলবো। তার পুরো নাম হলো- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী।অল্প বয়সেই তিনি পিতাকে হারান কিন্তু স্নেহময়ী মা ছিলেন একজন অত্যন্ত ধার্মিক ও বিদুষী মহিলা। বরাবরই তিনি পুত্রের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে নজর রাখতেন। তাই ইমাম বুখারী ছোট্টবেলা থেকেই এমনভাবে গড়ে উঠেছিলেন যে কোন হাদিস একবার মাত্র শুনলেই তার সনদসহ নির্ভুলভাবে সারা জীবন মনে রাখতে পারতেন। প্রায় কুড়ি বছর বয়সে বুখারী মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ মক্কায় হজ্জ পালন করেন এবং পরিশেষে সেখানে কুরআন হাদিসের ব্যাপক জ্ঞান চর্চায় লিপ্তহন। সেই বয়সেই মক্কায় অবস্থানকালেই তিনি রাসূলের (সা) রওজার পার্শ্বে বসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জ্যোৎস্না রাতসমূহে সারা রাত জেগে 'কাদায়া আল সাহাবা ওয়াল তাবেয়িন' ও 'আল তারিক আল কবির' নামক দু'টি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিহাসে তার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি বলতেন **"এমন কোন নাম ইতিহাসে নাই যার সম্বন্ধে কোন বিশেষ কাহিনী আমার জানা নেই।"** অতঃপর তিনি দেশ ভ্রমণে বের হন এবং

প্রায় চল্লিশ বছর আজকের মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে সেখানকার প্রায় একহাজারেরও বেশি জ্ঞানীদের সুহবত লাভ করেন এবং তাদের নিকট থেকে ব্যাপকভাবে হাদিস সংগ্রহ করেন। তিনি সর্ব সাকুল্যে প্রায় ছয় লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন যার ভিতর প্রায় দুই লক্ষ তার কণ্ঠস্থ ছিল। এই বিরাট সংগ্রহের ভিতর অনেক যাচাই বাছাই করে তিনি মাত্র নয় হাজার হাসিদ সহীহ হিসাবে গ্রহণ করে আল জামী আল সহীহ নামে তা সংকলন করেন। মাত্র একটি হাদিস সংগ্রহের জন্য তিনি কয়েকশত মাইল সফর করেন। তিনি খুবই আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ছিলেন। একবার বোখারার শাসক তার পুত্রদের শিক্ষা দেয়ার জন্য বুখারীকে তলব করেন, কিন্তু বুখারী এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, **শিক্ষাগ্রহণ করতে হলে শাহজাদাদেরকেই আমার পর্ণ কুটিরে আসতে হবে।"**
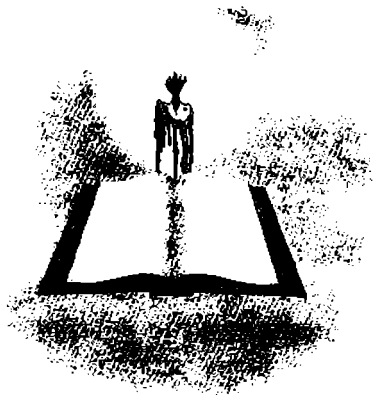
হিরোতাদা ওতোতা

এবার তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের এক মজার বন্ধুর সাথে। তার নাম হিরোতাদা ওতোতা। তোমরা শুনলে হয়তো আতকেউঠবে, আসলে তিনি জন্মগতভাবেই জন্মেছিলেন সম্পূর্ণ হাত-পা ছাড়াই। আল্লাহর এই পৃথিবীতে কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই কারো দু'টি হাত পা থাকলেই যেমন গর্ব করা উচিত নয়, ঠিক তেমনি যাদের এ ক্ষেত্রে অপূর্ণতা আছে, তাদেরও ভেঙ্গে পড়া উচিত নয়। তাই ২৩ বৎসর বয়েসি ওতোতা মুখ গোমরা করে বসে থাকেননি, সম্পূর্ন হাত-পা ছাড়াই তিনি তার যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। এই বিকলাঙ্গ জাপানী তরুণের লেখা বই সম্প্রতি জাপানে তো বটেই সারা বিশ্বেই আলোড়ন তুলেছে। ছবিতে তার এক বই 'নো-ওয়ানস পারফেক্ট'এর ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে তিনি এক তরুণীর সাথে কথা বলেছেন। তিনি এই বইয়ে জাপানের সামর্থ্যবান লোক ও বিকলাঙ্গ লোকদের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয়ার আহ্বান করেছেন। অর্থাৎ ওতোতা আজ জীবন যুদ্ধে এক বিজয়ী বীর। আমাদের অনেক বন্ধুই আছে যারা এ রকম প্রতিবন্দী হওয়ার পরও আজ আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। আমার প্রিয়বন্ধু দশম শ্রেণীর ছাত্র জন্মান্ধ আজহার এর কথা আজ মনে পড়ে। সে অন্ধ হয়েও দাবা খেলায় একসময়কার গাজীপুর জেলা চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিয়েছিল। আমার এক খালাতো ভাই সাহস করে তার সাথে

খেলতে গিয়ে গো-হারা হলো। প্রথম সাক্ষাতের সময় সে আমাকে একটি শুভ্রকাগজে অন্ধদের ব্রেইলী পদ্ধতিতে একটি লেখা লিখে দিয়েছিল। আজও যা আমার নিত্যসঙ্গী, তাতে লেখা আছে 'আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন, আমাদের দেখতে আসার জন্য ধন্যবাদ।' আরেক বন্ধু লিটন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। জন্মগতভাবে সে বোবা, অথচ মন তার সর্বদা কথা বলার জন্য আকুপাকু করে। প্রথম সাক্ষাতেই সে তার একটি কাগজে লিখলো, 'আমার নাম লিটন, আমাকে কি তোমার ভাল লেগেছে' তাকে ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারবে না। সে একজন মৃৎশিল্পের দক্ষ কারিগর, তার দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় মাটির ক্যানভাসে ফুটে ওঠে বর্ণাঢ্য সব প্রাকৃতিক দৃশ্য। আর হৃদয়েও তার সেই বর্ণাঢ্যতার বাগান, আমাদের হাত ধরে জোর করে তার নিজ হাতে মোছা সবচেয়ে বড় চেয়ারগুলোতে বসিয়ে দিল। বাজার থেকে চা আনলো, কোনভাবেই না খেয়ে যেতে দেবে না। তার সে আকুতিভরা ছলছল চোখের আবেদন ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসে এটা কার সাধ্য! আরেক ভাই কাজল, সত্যিই চোখ তার কাজল কালো কিন্তু একটি চোখে আলো নেই, একটি পা প্যারালাইজ্ড। কম্পিউটারে রয়েছে তার প্রচণ্ড দক্ষতা। জীবন সংগ্রামে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে চলতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শুধু তাই নয়, সারাদেশের মানসিক প্রতিবন্ধীদের সংগঠন ডব্লুসিডি-এর সে একজন কেন্দ্রীয় নেতা। অনেক অনেক যোগ্যতা থাকার পরও হয়তো তারা আমাদের দেশের সামগ্রিক অব্যবস্থার কারণে দ্রুত এগুতে পারছে না। কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে কি অবস্থা? চলো আমরা একটু খোঁজ নেই। মাইকেল কোলম্যান, আইবিএম কোম্পানির গ্লোবাল অপারেশনস্ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, বোমা বিকল করতে গিয়ে দুটো হাতেরই কব্জি পর্যন্ত হারিয়েছেন তিনি, কিন্তু সাহস হারাননি। যুদ্ধ শেষে আজ জীবনযুদ্ধে তিনি এখন বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ সিপাহসালার। ক্রিস হারম্যান, আমেরিকার ক্রেস্টর ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টিটিভ হিসাবে কাজ করছেন। তিনি একজন কোয়াড্রিপ্লেজিক অর্থাৎ দুটো হাত এবং দুটো পায়ের কোনকিছুই নাড়াতে পারেন না। চাকরিতে জয়েন করার সময় আবেদনপত্র স্বাক্ষরের জন্য তার মুখে কলম গুঁজে দিতে হয়েছিল রিক্রুটিং বোর্ডের চেয়ারম্যানকে। ভয়েস এ্যাস্টিভেটেড টেকনোলজি বা কণ্ঠস্বরচালিত প্রযুক্তির সাহায্যে হারম্যান শুধু তার কম্পিউটারকে বলে দেন কি কি করতে হবে। মুহূর্তের মধ্যে সেসব আদেশ তামিল হয়ে ফুটে ওঠে কম্পিউটারের মনিটরে। শুধুমাত্র আমেরিকাতে এসব বিশেষ নাগরিকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ

কোটি। এদের ভিতর যারা কর্মজীবী তাদের ওপর প্রায় ত্রিশ বছর লাগাতার সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, কিছু কিছু কাজে এরা সাধারণ মানুষদের চাইতে দক্ষতায় এগিয়ে আছে। তাদের গড়পরতা দক্ষতা, বিশ্বস্ততা আর নিয়মনিষ্ঠ উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই তাদের এগিয়ে নিয়ে যায় মালিক পক্ষের খুবই কাছাকাছি। বর্তমান শতাব্দীর বেস্টসেলার বুক 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'গ্রন্থের লেখক স্টিফেন হকিং। বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে প্রতিভাধর এই বিজ্ঞানী মটর নিউরন ডিজিজে আক্রান্ত হয়েও ভয়েস এ্যাস্টিভেডেটড টেকেনালজি ব্যবহার করে হুইলচেয়ার বসে শুধু কথাবার্তা, এমনকি চোখের পাতা নড়াচড়ার মাধ্যমে একের পর এক তার গবেষণার কাজ শেষ করছেন। হায়! আমাদের দেশেও যদি সেই পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করা যেত, যাতে করে এই সকল প্রতিবন্ধীদের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতো জিনিয়াসরা। আমরা প্রাণ খুলে সেই সকল বন্ধুদের জন্য দোয়া করবো। চলো এবার শুরু করি আমাদের পূর্বের আলোচনার ধারাবাহিকতা, কেমন?
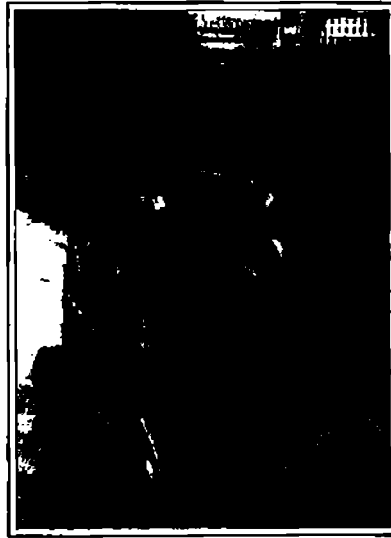
স্টিফেন হকিং

আল-কিন্দী মুসলিম জগতের 'আল ফাইলাসুফ' বা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসাবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন: পাশাপাশি মৌলিক বিজ্ঞান সাধনায়ও তার নাম আরব জগতে সবচাইতে বিখ্যাত। তার পুরো নাম ছিল আবু ইউসুফ

ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দী। তিনি ৮১৩ সালে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। আল-কিন্দী একাধারে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, রাজনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন আর সঙ্গীতেও তার আকর্ষণ কম ছিল না। এ রকম বারোটা স্বতন্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরও তিনি আরবী, গ্রীক, হিব্রু, ইরানী, সিরীয়াক এমনকি সংস্কৃতসহ ছয়টি ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করেন। ষোল শতক পর্যন্ত জগতে যে সব মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে বারোজনের ভিতর একজন হিসাবে আল-কিন্দীকে গণ্য করা হয়। তিনি দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, রাজনীতি, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং সঙ্গীতের ওপর প্রায় দুইশত পয়ষট্টিখানা গ্রন্থ রচনা করেন। আজও ইউরোপ আল-কিন্দীকে দর্শনের প্রথম পরিচায়ক ও ভাষ্যকার হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয়।

তিব্বিয়া বা চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের ভিতর সর্বাপেক্ষা প্রথম উল্লেখযোগ্য সাধক ছিলেন আলী ইবনে সহল-রব্বান আল-তাবারী। তিনি সম্ভবত আট শতকের শেষের দিকে তাবারীস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবি ছাড়াও সিরিয়াক, ফারসি, হিব্রু ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। আলী তাবারী চিকিৎসা-বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'ফিরদৌস আল হিকমাহ ফি আল-তিব্ব' বা ঔষধের স্বর্গ নামক গ্রন্থটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এটিকে আরবি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।

বর্তমান ইরানের রাজধানী তেহরানের অন্তর্গত রায় নগরে ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া জন্মগ্রহণ করন। ১২২০ সালে মোঙ্গলদের হাতে ধ্বংসের আগে এ শহরটি মুসলিম জাহানে জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিল। সেই জন্য আবু বকর জন্মভূমির নামানুসারে নিজের নিসবা আল রাযী গ্রহণ করন। তিনি আলকেমী নিয়ে গবেষণা করতেন কিন্তু তার সবচেয়ে বড় অবদান চিকিৎসাশাস্ত্রে। তিনি নানা বিষয়ে কমপক্ষে দুইশত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার ভিতর চিকিৎসাশাস্ত্রেই প্রায় একশত। তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে বসন্ত ও হাম রোগ সম্বন্ধে 'আল জুদারী ওয়াল হাসাবাহ' নামক পুস্তকটি। এই গ্রন্থটি ল্যাটিন ও ইউরোপীয় সকল ভাষাতেই তরজমা করা হয়। শুধু ইংরেজি ভাষাতেই ১৪৯৮ সাল থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত এটি চল্লিশবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তার আরেকটি শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে 'আল-হাবী' সর্বপ্রকার রোগ সম্বন্ধেবিশদআলোচনাসহ চিকিৎসা প্রণালী ও ঔষধের

ব্যবস্থা সম্বলিত একখানি আভিধানিক গ্রন্থ। এটি কুড়ি খণ্ডে সমাপ্ত হয়, বর্তমানে এর দশটি খণ্ডের অস্তিত্ব আছে। 'আল-হাবী' ইউরোপীয় চিন্তারাজ্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। ১৪৮৬ সালের পর হতে ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই এই বইটি ক্রমাগত দ্রুত ও প্রকাশিত হতে থাকে। এর নবম খণ্ডটি ইউরোপের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পুস্তক হিসাবে ষোলশতক পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। আল রাযীর জ্ঞানার্জনে কেমন আগ্রহ ছিল এটি তার নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেই বুঝা যায়; **"যারা আমার সাহচর্যে এসেছেন, কিংবা আমার খোঁজ রাখেন, তারাই জানেন জ্ঞান-আহরণে আমার কী আকুল আগ্রহ, কী তীব্র নেশা। কিশোরকাল হতেই আমার সকল উদ্যম, এই একটি মাত্র নেশায় ব্যয়িত হয়েছে। যখনই কোন নতুন বই হাতের কাছে পেয়েছি, কিংবা কোন জ্ঞানীর সন্ধান পেয়েছি তখনই অন্য সকল কাজ ফেলে, বহু আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেও নিবিষ্ট মনে বইখানা পাঠ করেছি কিংবা সে জ্ঞানীর নিকট যথাসাধ্য শিক্ষা গ্রহণ করেছি। জ্ঞান সাধনায় আমার এমন অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ সহিষ্ণুতার ফলেই মাত্র এক বৎসরে আমি কুড়ি হাজার পৃষ্ঠার মৌলিক রচনা লিখেছি (প্রতিদিন প্রায় ষাট পৃষ্ঠা করে) এবং তাও তাবিজ লেখার মতোই ঝরঝরে অক্ষরে। প্রায় পনের বৎসর আমি ব্যয় করেছি আমার বিরাট চিকিৎসাবিধান লিখতে। দিনরাত্র এমন কঠোর পরিশ্রম করেছি যে, শেষে আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলি। কিন্তু এখনও আমার জ্ঞান পিপাসা মেটেনি আজও আমি অন্যকে দিয়ে বই পড়িয়ে শুনি কিংবা আমার রচনা লেখাই।"**

আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আল-তাবারী ছিলেন জাতিতে ইরানী। তিনি ইরানের সবচেয়ে গিরিসংকুল স্থান তাবারিস্থানে ৮৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও ভুতত্ত্বে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। এ সময় তার সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিলো কুরআনের তাফসির ও হাদিসের। তিনি জ্ঞানীদের সংস্পর্শে গিয়ে সরাসরি জ্ঞানার্জনের জন্য আরব ছাড়াও মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশ কয়েক বৎসর সফর করেন। এ সময় তাকে বহুদিন অর্ধাহারে মনকি অনাহারেও কাটাতে হয়েছে। একবার অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে ওঠে যে, উপর্যুপরি কয়েকদিন অনাহারে কাটিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজের জামার দুটি হাতারই বিনিময়ে তাকে রুটি সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

আল-তাবারী ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন একজন শ্রেষ্ঠ

তাফসীরে কুরআন এবং একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে। তার তাফসিরের নাম 'জামি আল-বয়ান ফি তাফসীর আল-কুরআন। এটি বর্তমানে সুবৃহৎ ত্রিশটি খণ্ডে প্রকাশিত। তাবারীর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের নাম 'আখবার আল-রাসূল ওয়াল মুলুক' অর্থাৎ পয়গাম্বর ও রাজাদের ইতিহাস। বর্তমানে ইতিহাসখানি মাত্র পনের খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পণ্ডিতদের বিশ্বাস যে আসল ইতিহাসখানি এর কমপক্ষে দশগুণ ছিল। কথিত আছে যে, একশত পঞ্চাশখণ্ডে সমাপ্ত এই বিশাল ইতিহাস যখন তার ছাত্ররা পড়তে অস্বীকার করে, তখন তিনি আক্ষেপ করে অধুনা প্রকাশিত পনেরো খণ্ডের সার-সংকলনটি করেছিলেন। এই বিরাট গ্রন্থে সৃষ্টির আদিকাল থেকে ৯১৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসের বর্ণনা আছে। জ্ঞানানুশীলনে তার জীবনকে তিনি কিভাবে উৎসর্গ করেছিলেন তার পরিচয় মেলে যখন আমরা জানতে পারি যে, তিনি ক্রমাগত চল্লিশ বছর যাবত দৈনিক চল্লিশ পৃষ্ঠা করে মৌলিক লেখা রচনা করতেন। (অর্থাৎ এ সময়ে তিনি রচনা করন প্রায় পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার পৃষ্ঠা)

৮৫৮ সালে হাবরান অঞ্চলে আল-বাত্তানী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি বাগদাদের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সেই আল-বাত্তানী বাগদাদ ত্যাগ করে ফোরাত নদীর পূর্ব উপকূলস্থ আল বাক্কা নামক স্থান গমন করেন এবং সেখানে আমৃত্যু তিনি গবেষণায় লিপ্ত থাকেন। এখানে তার নিজস্ব গবেষণাগার ও গবেষণার উপযোগী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল। তিনি গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যায় একজন মৌলিক গবেষক ছিলেন। এ দুটি বিষয়ে তিনি অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার অধিকাংশই আজ কালের করালগ্রাসে হারিয়ে গেছে।

দশ শতকের মাঝামাঝি একজন শান্ত প্রকৃতির ক্ষুদ্রাকৃতি তুর্কী পোশাক-পরা বৃদ্ধলোক আলোপ্পোর হামদানী আমীর সায়েফউদ্দৌলার দরবারে উপস্থিত হন। তাকে আট-দশটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে দেখে এবং ইসলামী ধর্মতত্ত্বে, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এমনকি কবিতা ও গানে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা দেখে গুণগ্রাহী আমীর তাকে সম্মানে আপন দরবারে স্থান দেন। এর কিছুদিনের ভিতরই তাকে সভাপতির মর্যাদা দান করেন। এই জ্ঞানী লোকটিই প্রাচ্যের 'মুয়াল্লিম-সানী' বা দ্বিতীয় শিক্ষাগুরু আবু নসর মুহাম্মদ আল ফারাবী। তিনি আকৃতিতে ক্ষুদ্র, চক্ষুতারকা আরো ক্ষুদ্র, চক্ষুতারকা আরো ক্ষুদ্র এবং সামান্য কয়েকগাছি শ্মশ্রু শোভিত পুরুষ ছিলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন কিনা বা তার পুত্র-কন্যা

ছিল কিনা, কিছুই জানা যায় না। কিন্তু অদম্য জ্ঞানস্পৃহা তাকে জন্মভূমি ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ কর, কাজীর মতো সম্মানিত পদে ইস্তফা দিয়ে পঁচিশ বৎসর বয়সে তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি বাগদাদে তিনি গমন করেন। প্রায় সত্তরটি বিরাট নোটবুকে দর্শনশাস্ত্রের সারাংশ তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফারাবী অ্যারিস্টটলের আত্মা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থটি একশ'রও বেশি বার এবং পদার্থ বিদ্যা বিষয়টি চল্লিশবার পাঠ করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচ্যের সুধী-সমাজে অ্যারিস্টটল মুয়াল্লিম আউয়াল বা আদিগুরু ও ফারাবী মুয়াল্লিশ সানী বা দ্বিতীয় গুরু হিসাবে পরিচিত। মুসলিম দার্শনিকদের পিরামিডে তার নাম সর্বোচ্চে। তিনিই ইসলামের প্রথম বিশ্বকোষ-রচয়িতা ও মুসলিম তর্কশাস্ত্রের জন্মদাতা।

ঐতিহাসিক ও ভূতাত্ত্বিক হাসান আলী আল মাসুদী বাগদাদে সম্ভবত নয় শতকের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। আল-মাসুদী বাল্যেই উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইতিহাস, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, ভুগোল, জ্যোতিষশাস্ত্র ও প্রাণীতত্ত্বে তার অসাধারণ বুৎপত্তি জন্মে, সাহিত্য-সংগীত ও কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সমসাময়িক আলেমদের মতোই বিশ্বাস করতেন "আর-রিহ্‌লাহ্‌ ফি-তালাব আল ইলম" অর্থাৎ সফর করলে জ্ঞানবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তাই পথের মোহে যৌবনেই তিনি ভ্রমণে বহির্গত হন ও প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী তৎকালীন দুনিয়া চষে বেড়ান। আল মাসুদী তার দীর্ঘ সফরের অভিজ্ঞতা থকে শেষজীবনে সুবৃহৎ গ্রন্থ 'মারূয-আল-যাহাব ওয়া মায়াদিন আল জওহর' বা 'সোনালি ময়দান হীরার খনি' প্রণয়ন করেন। এই বিরাট ইতিহাস ভুগোলের বিশ্বকোষখানি ত্রিশটি খণ্ডে সমাপ্ত। এই জন্য তাকে মুসলিম ঐতিহাসিকদের ভিতর হেরোডোটাস বলা হয়। উক্ত গ্রন্থের উপক্রিমণিকায় মাসুদী নিজেই বলেছেন 'ইতিহাস রচনার পূর্বে তিনিপঞ্চাশজন মশহুর ঐতিহাসিকের গ্রন্থ পাঠ করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তার আরেকটি বিরাট গ্রন্থের নাম 'মিরাতুল যামান বা আখবার-উয-যামান'। এটির অসম্পূর্ণ অংশ ত্রিশ খণ্ডে ভিয়েনার গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। আল্লাহপাক মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমরা সর্বোত্তম জাতি মানবতার কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে– অথচ আজ আমরা পৃথিবীর যে দিকেই তাকাই না কেন, কী দেখতে পাই? দেখতে পাই সারা পৃথিবীতে মুসলমানেরা আজকে চরম পশ্চাদপদতা, বঞ্চনা আর সর্বগ্রাসী নির্যাতনের

শিকার। তাহলে কি আল্লাহর ঘোষণা কখনও মিথ্যা হতে পারে? না বরং আসল সত্য হলো, যাদের উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা দিয়েছেন আমরা সেই সত্যিকার মুসলমান হতে পারিনি।

যোগ্যতাই বড় শক্তি

গামা পাহ্‌লোয়ান আর কবি আল্লামা ইকবাল ছিলেন এক জায়গার মানুষ; সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল। খিলাফত আন্দোলনের একসভায় উভয়েই উপস্থিত। হঠাৎ কবি দাঁড়িয়ে বললেন, এইবার গামা সাহেব বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলবেন। সকলে হৈ চৈ করে উঠলো 'হ্যাঁ', 'হ্যা' শুনব, আরা গামা সাহেবের বক্তৃতা শুনবো। গামা সাহেবের না-না-আর্তচিৎকার সকলের উৎসাহের বন্যায় ভেসে গেল। অগত্য তিনি উঠলেন; অতি কষ্ট বললেন, **"ভাই সকল আপনারা দেহের শক্তি বাড়ানোর জন্য হামেশা সকাল-সন্ধ্যা কুস্তি করবেন। কাঁপা-গলায় এ কয়টি কথা বলতে বলতে তিনি বসে পড়লেন। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, রোজ সকালে আমি একহাজার বৈঠক দেই এক জররা ঘাম দেখা যায় না, আর এই শ্বশুরের পুত কবি আমাকে কি মুশকিলে ফেলেছিল, যে আমার শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে।"** ওপরের কৌতুকটি থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই? আমরা শিক্ষা পাই শারীরিক শক্তিতে একজন যতই বলিয়ান হোক না কেন জ্ঞানের শক্তিতে যদি সে দক্ষ না হয়, তবে কত অসহায় হয়ে যেতে পারে। এবার নিচের উদাহরণ থেকে শিখবো শারীরিক শক্তিতে দুর্বুল হয়েও কেমন করে মানুষ ইচ্ছাশক্তি বলে বলীয়ান হয়ে বড় হতে পারে।

১৯৭৪ সালের কথা। ২১ বছর বয়সী এক কোরিয়ান তরুণী তার প্রথম সন্তান প্রসব করলেন। মায়োবানি মরণযন্ত্রণায় ছটফট করছিল, একজন ইন্টার্নী ডাক্তার তার চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ছিল। অবশেষে ৯ পাউন্ড ওজনের এক পুত্রসন্তান ভুমিষ্ঠ হল। কিন্তু একি, নবজাতকের কণ্ঠে কোন সাড়া নেই। আঁৎকে উঠলো ডাক্তার, কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও বিশেষ ফল হল না। শিশুটির শরীর নীল হয়ে গেল। "আমি দুঃখিত ও আর বেঁচে নেই", ডাক্তার শিশুটির পিতামাতাকে সমবেদনা জানিয়ে, একটি কাপড়ে মৃত শিশুকে জড়িয়ে র‌্যাকে তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন। ব্যথিত পিতা ইয়ং জাং চুং নিজের প্রথম সন্তানের কবর খুঁড়তে বাইরে যাওয়ার পরই মায়াবানি পাগলের মত কাড়পে জড়ানো দেহটি বুকে জড়িয়ে ধরে পরম প্রশান্তিতে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। প্রায় দু'ঘন্টা

পর মায়োবানি জেগে উঠল, তার কোলে সন্তান হঠাৎ নড়ে উঠেছে। শিশুর গায়ের চামড়া এখন গোলাপী বর্ণ ধারণ করেছে। ক্রমে তার নিঃশ্বাসের শব্দও পাওয়া গেল এবং হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল শিশুটি। চিৎকার করে উঠল মায়োবানি, আমার সন্তান বেঁচে আছে! এই অলৌকিক শিশুটির নাম হান-কী। জন্মমুহূর্তে ডাক্তারের ভুলের কারণে হান-কীর ব্রেনের গুরুত্বপূর্ণ নার্ভ কেটে যাওয়ায় সে সেরেব্রাল পালসি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ওর বয়স দুই বছর হওয়ার পরও সে হাঁটতে বা ভালমত কথা বলতে পারে না, মাথা সোজা রাখতে পারে না, হাতের আঙুল মুঠো করতে বা নাড়তে পারে না। উদ্বিগ্ন মা ১৯৭৮ সালে চার বছর বয়সী হান-কীকে বড় ডাক্তার দেখালেন। ডাক্তার সেরেব্রাল পালসি শনাক্ত করে বললেন, এ রোগ কখনো ভাল হয় না।কিন্তু মায়োবানি তার সন্তানকে উপযুক্ত মানুষ করে গড়ে তুলতে আবারো সংকল্পবদ্ধ হলেন। তিনি প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে হান-কীকে ভর্তি করার জন্য খোঁজখবর নিতে গেলেন। দেখলেন শিশুদের চেয়ারের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে না হান-কীকে এ অবস্থার দিকে তিনি ভাবতেও পারেন না। মায়োবানি হান-কীকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে তার আইকিউ টেস্ট করলেন, ডাক্তার দেখলেন শিশুটির আইকিউ গড় সাধারণ শিশুদের চাইতে অনেক ওপরে এবং সে খুব বুদ্ধিমান। মায়ের আত্মবিশ্বাস গেল বেড়ে। এরপর তিনি ডাক্তারের দেয়া আইকিউ রিপোর্টসহ হান-কীকে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করতে সক্ষম হলেন। পরর দিন মায়োবানি তার ৬৫ পাউন্ড ওজনের পুত্রকে কাঁধে নিয়ে স্কুলে আনা-নেয়া করতে লাগলেন। দেখে লোকজন হাসাহাসি করে কিন্তু মায়োবানি অটল অবিচল হান-কী অতিকষ্টে পাখির মত পেন্সিল ধরতে পারত এবং প্রচণ্ড অধ্যবসায়ীভাবে সে কাগজে আঁচড় কেটে সঠিক উত্তরটি লিখত। স্কুল ওর চার বছর পার হওয়ার পর এবং একসময় নিজের পায়ে হাঁটতে চেষ্টা করেও সফল হল সে। মায়োবানি ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী বন্ধু। এ ছাড়া আর সবাই হান-কীকে এড়িয়ে চলে ওর অদ্ভুত আচরণের জন্য এভাবে বছরের পর বছর গড়িয়ে একসময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে উচ্চ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস করে সে। মায়োবানির স্বপ্নের পালে জোর হাওয়া লাগে এবার। সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কোরিয়ার সবচে' মর্যাদাশীল বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ৫ হাজার সীটের জন্য পাঁচ লক্ষাধিক ছাত্র পরীক্ষা দেয়। অর্থাৎ প্রতি

আসনের জন্য একশ' জন। এখানে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথমবারের অনুত্তীর্ণ হয়েও দমল না হান-কী। পরের বছর ১৯৯৩ সালে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল হান-কী। প্রথমবারের মত একজন সেরেব্রাল পালসি রোগী সিউল ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে নিলে। হান-কী জাতীয় বীরের মত মর্যাদা পেল। কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম য়ং সাম নিজে টেলিফোন করে অভিনন্দন জানালেন তাকে। ১৯৯৪ সালের মে মাসে সিউলের সেজং কালচারাল সেন্টারে এক জমকালো অনুষ্ঠানে কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লী ইয়ং ডাক মঞ্চ থেকে মাইকে মায়োবানির নাম ঘোষণা করলেন এবং হলভর্তি হর্ষোৎফুল্ল দর্শকরা অভিনন্দন করল তাকে। প্রধানমন্ত্রী তার হাতে 'প্যারন্ট অব দি ইয়ার' সার্টিফিকেট তুলে দিলেন। ১৯৯৫ সালে ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় বছরে হান-কী সর্বাচ্চ নম্বর পেয়ে একাডেমিক স্কলারশিপ লাভ করে।

চলো এবার, ভুগোল শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান নিয়ে কিছু বলি। ভূগোল শাস্ত্রে তাদের অনন্য অবদানের পিছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে হজ্জ পালন। প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিমের জন্য হজ্জ ফরয, আর তাই সারাবিশ্বের মুসলিমদের কাছে মক্কা তথা আরব ভৌগোলিকভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত মক্কাকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার ভুল-চিত্র অঙ্কিত হতে থাকে। অবশেষে, খলিফা আলমামুনের প্রচেষ্টায় আল খারেজিমী উনসত্তরজন ভুতত্ত্ববিদসহ কঠোর সাধনা করে একখানি 'সুরাত আল আরদ' বা দুনিয়ার বাস্তব রূপ দাঁড় করান। এটাই পরবর্তীকালে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কনে মডেল হিসাবে কাজ করে। তাতে পৃথিবীর আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে সাতটি ইকলিম বা মন্ডলে ভাগ করা হয়েছিল। আজ আমরা সাগরবেষ্টিত সপ্ত-মহাদেশে বিভক্ত যে পৃথিবীর বাস্তবরূপের সাথে পরিচিত, তার নির্ভূল পরিকল্পনা মুসলিম ভুতত্ত্ববিদদের হাতেই রচিত হয়েছিল এগারো-শ' বৎসর আগে।

বিশ্ব মাঝে শীর্ষ হব

You will be glad to know that my group score H.D. (Higher distinction, that means above 85%) with marks of 97% and mine was the best & highest scord project in grifith University's History of 47 years. I was crying when they announced my name as a Bangladeshi student and my national song playing at

that time & I had my flag in my hand. That was the most memorable day in my life & they selected my project in National Australia Universities Software Competition....উপরোক্ত ই-মেইলটি পাঠিয়েছেন বাংলাদেশী ছাত্র সাজ্জাদুল ইসলাম অস্ট্রেলিয়ার নাম করা গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিষয়ক লেখক জনাব শামিম তুষারের কাছে। ই-মেইলের হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যে ফুটে উঠেছে তার ব্যক্তিগত সাফল্য ও দেশপ্রেমের এক অনবদ্য চিত্র। বাংলাদেশী ছেলে সাজ্জাদুল ইসলাম সেখানে মাস্টার অব ইনফরমেশন টেকনোলজিতে এম এস করেছেন। ডাটাবেজ ডেভলপমেন্ট ইন ওরাকল বিষয়ে এখন তিনি ডক্টরেট করছেন। তার ই-মেইলে যে প্রজেক্ট আর সফটওয়্যার কমপিটিশনের কথা বলা হয়েছে তা ঘটেছে তার এমএস এর শেষ সেমিস্টারে। অস্ট্রেলিয়ান বন্ধুদের সাথে নিয়ে তিন মাস অক্লান্ত পরিশ্রম কর প্রজেক্টটি শেষ করেন সাজ্জাদ। গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটির হলরুমে সমস্ত শিক্ষক আর সিলেকশন বোর্ডের সামনে একে একে উপস্থাপন করা হয় সকল গ্রুপের প্রজেক্টসমূহ। সাজ্জাদের গ্রুপ অর্জন কর হায়ার ডিস্টিংশন মার্কস অর্থাৎ ৮৫% এর উপরে নাম্বার। তাদের তৈরি সফটওয়্যারটি এতই ভাল হয়েছিল যে সিলেকশন কমিটি তাদের গ্রুপকে মোট ৯৭% নাম্বার দান করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশী ছেলে সাজ্জাদের তৈরি প্রজেক্টের প্রাপ্ত নাম্বার গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ৪৭ বৎসরের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলরুমে বাজানো হলো বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। হাতে লাল সবুজ পতাকা আর বুকে সমগ্র সবুজ বাংলাকে ধারণ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো গর্বিত সাজ্জাদ। নিজের সাফল্যে নয় বরং সে কান্নার পেছনে ছিল দেশকে উপরে তুলে ধরার এক অপার্থিব আনন্দ। এখানেই শেষ নয় অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের বিজয়গাঁথা। এর কয়েকদিন পরেই একটি চিঠি পান সাজ্জাদ। তার তৈরি প্রজেক্ট গোটা অস্ট্রেলিয়ার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কর্তৃপক্ষ তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য। সে অনুষ্ঠানে গিয়ে আরেক চোখ ভিজানো দৃশ্যের সাক্ষী হন তিনি। উপস্থিত হাজার হাজার সফটওয়্যার নির্মাতা, আর বিশেষজ্ঞের সামনে বাংলাদেশী ছাত্র হিসাবে পুরস্কার গ্রহণের সময় অস্ট্রেলিয়ান পতাকার ওপরে উড়ানো হয় বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা। চলো বন্ধুরা, আমরা সবাই আমাদের গর্ব সেই সাজ্জাদের জন্য হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা একত্র করে উচ্চারণ করি-মারহাবা, মারহাবা!

আর আমাদের এই ধ্বনি ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাক সবুজ স্বদেশ থেকে সেই সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়, প্রিয় ভাই সাজ্জাদের কাছে।

চোখের আলো নয়, মনের আলোতে বিশ্ব জয়

চলো এবার তোমাদের নিয়ে উড়াল দিই দেশের মায়া কাটিয়ে বিদেশে। চলো পরিচিত হই দৈহিকভাবে অপূর্ণাঙ্গ কিন্তু মানসিকভাবে খুবই শক্তিশালী কিছু ভাইয়ার সাথে এবং নভোচারিনী এক বোনের সাথে।

তোমাদের মতোই ফিলিপাইনের এক ছেলে নাম বিয়েনভেনিডো ক্যানোডিজাডো সংক্ষেপে বিয়েন। বয়স কিন্তু মাত্র ষোল। ম্যানিলার ইউনির্ভাসিটি অফ সান্টো থমাসে পলেটিক্যাল সায়েন্সে সে এই কেবল অনার্স শুরু করেছে। বলা যায়, আমাদের তুলনায় একটু আগেভাগেই, তাই না? পড়াশোনার প্রতি তার ভীষণ আগ্রহ। তার ইচ্ছা আছে এখানকার পড়াশোনা শেষ করেই অ্যাটিনিও ল স্কুলে সে আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী নেবে। তোমরা কি জান? অ্যাটিনিও ল স্কুল খুব নাম করা প্রতিষ্ঠান। এখানে চান্স পাওয়া কিন্তু মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তারপরও বিয়েন সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসী। স্কুলের ক্লাসগুলিতে সে বরাবরই ভালো গ্রেড পেয়ে এসেছে। তার বিশ্বাস এসব গ্রেডের জোরেই সে কোন একটি স্কলারশীপ জুটিয়ে ঠিকই ঢুকে পড়বে অ্যাটিনিওতে।

নিজের বয়েসি আর দশটা ছেলের মতোই হাসিখুশি আর ব্যস্ত সময় কাটায় বিয়েন। নিয়মিত ক্লাস করে। বাসা থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করে। অবসরে আড্ডা দেয় ইন্টারনেটের চ্যাট রুমগুলোতে ঢুকে। পড়াশুনা, পরিশ্রম, জীবনযাত্রা, স্বপ্ন, বিনোদন সবদিক হতেই বিয়েনের সঙ্গে নানা মিল তার সহপাঠীদের। অমিল কেবল একটাই। ইস্! সে অন্যদের মতো চোখে দেখে না। পৃথিবীর রং রূপ সে আস্বাদন করতে পারে না। বিয়েন দেখে তার মনের চোখ দিয়ে, তার গাঢ় অনুভুতি দিয়ে। হায়! গোটা দুনিয়ার পনের কোটি দৃষ্টিহীন মানুষের মধ্যে সেও একজন। মনের চোখ মেলে সাদা ছড়ি হাতে এগিয়ে চলা ব্যতিক্রমী একজন।

অসাধারণ মনের জোরই বিয়েনকে এমন ব্যতিক্রমী করে তুলেছে। দুরারোগ্য এক নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডারের কারণে জন্ম থেকেই দৃষ্টিহীন সে। এমনকি সমস্যা হয় বাম কানে শুনতে। মাঝে মাঝে মুখমণ্ডলসহ শরীরের বাম দিকটাও তার অবশ হয়ে যায়। তারপরও থেমে থাকেনি বিয়েন। স্কিন রিডিং সফটওয়্যার, স্পিচ সিনথেসাইজার এর মতো অ্যাসিসটিভ টেকনোলজির সাহায্য নিয়ে চমৎকার দক্ষতা অর্জন

করেছে সে কম্পিউটার ব্যবহারে।
ফিলিপাইন্স ব্লাইন্ড ইউনিয়ন পরিচালিত কম্পিউটার লিটারেসি কোর্স শেষ করেছে সে সাফল্যের সাথে।
সুপ্রিয় ভাইবোনেরা, চলো এবার আরেক বন্ধুর সাথে পরিচিত হই। ফিলিপাইন থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকার ওহিও নগরীতে ছেলেটির বাস। নাম সুলেমান গকিইট। কি পরিচিত লাগছে নামটা? হ্যাঁ, তার জন্ম তুরস্কে, জাতিতে সে মুসলিম। তার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তার পরিবার স্থায়ীভাবে আমেরিকায় চলে আসে। এখন তার বয়স একুশ। ওহিরও ইউনিভার্সিটি অব টলেডোতে গ্রাজুয়েশন করছে সুলেমান। পাশাপাশি কাজ করছে কম্পিউটার ফার্ম ইন্টোলিডাটা কেটনোলোজিতে। দুই বৎসর বয়স হতেই সে দৃষ্টিহীন। কিন্তু ইন্টিলিডার কর্পোরেশনে বার্ষিক ১৪ হাজার ডলারের চাকুরীটা বাগাতে এই অন্ধত্ব তার কোন সমস্যাই করেনি। বরং ৭০ মিলিয়ন ডলারের কোম্পানিতে কম্পিউটার টেকনিশিয়ান এবং প্রোগ্রামার হিসাবে তাকে রাজকীয় সম্মান দেখানো হয়।
দুই বৎসর বয়সের সময়েই রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা নামকজটিল একটা অসুখে চোখের জ্যোতি হারাতে শুরু করে সুলেমান। উন্নত চিকিৎসার খোঁজে সুলেমানকে বুকে নিয়ে খোদ আমেরিকার মায়ো ক্লিনিকে ছুটে আসেন তার বাবা। কিন্তু হায়! বিশ্ববিখ্যাত মেডিক্যাল সেন্টারটিও ব্যর্থ হয় তাদের স্বপ্ন পূরণে। তবে ডাক্তার বাবাকে পরামর্শ দেন, সুলেমানকে সাধারণ ছেলেমেয়ের মতোই সমান গুরুত্ব দিয়ে মানুষ করতে। কোন প্রকার হেলাফেলা না করতে। সে কথা শুনেই একেবারে টার্কি থেকে সপরিবারে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন তার বাবা। ছেলেকে ভর্তি করে দেন স্কুলে। স্কুল পর্যায়েই সুলেমানের অসামান্য স্মৃতিশক্তির কথা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। এক দুইবার শুনেই যে কোন কিছু মুখস্থ করে ফেলতে পারে সে। দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে সে অসামান্য কৃতিত্বের সাথে স্কুলের গন্ডি ডিঙ্গিয়ে ভর্তি হয় কলেজে। একদিন কলেজের বুলেটিন বোর্ড ঝুলানো ইন্টেলিডাটার রিক্রুটিং অ্যাডের কথা কানে আসে তার। অ্যাপ্লাই করে সুলেমান। পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার হার্ডওয়ার সফটওয়্যারের কাজ দারুনভাবে শিখেছে সে। একজন ফুলটাইম প্রোগ্রামার এবং কম্পিউটার টেকনিশিয়ানকে রীতিমত ছাঁটাই করে পুরো দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাকে। অবশ্য সুলেমান সে বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে। ছোটবড় অসংখ্য প্রজেক্টে তার কোম্পানির টেকনিক্যাল নেতৃত্ব দিয়েছে

সে। এখন কাজ করছে সে সমান তালে। সে ছাড়াও আমরা প্রায় সাড়ে তিনশত কর্মচারী কর্মকর্তা আছেন ইন্টেলডাটা কর্পোরেশনে। কিন্তু সেই হলো একমাত্র কর্মকর্তা যে চব্বিশ ঘন্টা অনকলে থাকে। অর্থাৎ দিনরাত যখনই ডাকা হোক অফিসে এসে কাজে বসে যায় সে। দৃষ্টিহীন সুলেমানই এখন ৭০ মিলিয়ান ডলার কোম্পানিটির টপ ট্রাবল শুটার। হয়তো ভবিষ্যৎ এ নতুন আমেরিকা গঠনে সে হবে একজন পথিকৃৎ। বন্ধুরা এ সকল উদাহরণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম দৈহিক অপূর্ণতা এমনকি অন্ধত্বও মানুষের জীবনে কোন বাঁধা নয় বরং এগুলিকেই শক্তি হিসাবে কাজে লাগিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়া যায় সম্মুখ পানে।

এই ফাঁকে ছোট্ট বোনদের উদ্দেশ্যেও বলতে চাই, শুধু মেয়ে হয়ে জন্মাবার কারণেই কি জ্ঞান বিজ্ঞান আর উন্নয়নে তোমাদের পিছিয়ে থাকা ঠিক হবে? এটা এক ধরনের হীনমন্যতা নয় কি? রাসূল (সা)-এর সময়ও আল হাদিস স্মরণ ও সংরক্ষণে আয়েশা (রা)-এর অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। বর্তমান সময়েও ইরানে একজন পর্দানশীল মহিলাই ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আজকে তোমাদের দু-তিনজন জগদ্বিখ্যাত মহিলার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব।

১৯৬৩ সাল, রাশান নভোচারী ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেন। মহাশূন্যে তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা নভোচারী। ১৯৮৩ সালের আগ পর্যন্ত আমেরিকায় মহাশূন্য যানে নভোচারী হিসাবে কোন নারী নির্বাচিত হননি। আমেরিকায় প্রথমবারের মত ১৯৮৩ সালে মহাশূন্য যানের জন্য একজন নারী নভোচারী হিসাবে নির্বাচিত হন। ৩২ বৎসরের স্যালি রাইড স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জার মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেন। স্যালির পরে অনেক মেয়েই নভোযাত্রী হয়েছেন কিন্তু নভোযানের নেতা হয়েছেন মাত্র একজন। তিনি হলেন এ্যাপোলো-১১ মিশনে স্পেস শাটল কলাম্বিয়ার কমান্ডার এলিন কলিন্স। আমেরিকার স্পেস শাটল কলাম্বিয়ার মহাকাশ যাত্রাকে নাসা কর্মকর্তারা স্মরণীয় করে রাখতে চাইলেন এ্যাপোলো-১১'র উড্ডয়নের ত্রিশতম বার্ষিকী পালনের মাধ্যমে। কর্মকর্তারা চাইলেন এই বিশেষ দিনটিতেই কলাম্বিয়া মহাশূন্যে যাত্রা করুক। কলাম্বিয়া স্পেস ফ্লাইটটির পাইলট সিটে বসে আছেন এলিন কলিন্স-আমেরিকার কোন স্পেস ফ্লাইটের প্রথম মহিলা কমান্ডার। তার মহাকাশ যানটি আকাশে উড়াল দিল। আর নারীদের ইতিহাসে তৈরি করলো এক গৌরবোজ্জ্বল বিজয়গাঁথা।

ডঃ
সৈয়দ
আলী
আশরাফ

ছোট থাকবো না মোরা চিরদিন

চলো একটু বেড়িয়ে আসি সেই ১৯৪৫/৪৬ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র হল সলিমুল্লাহ হলে। সেখানে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হচ্ছে। ডায়াসে আছেন হল ছাত্র সংসদের সভাপতি পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন। কি আশ্চার্য ব্যাপার দেখ একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বাংলা রচনা, বাংলা বিতর্ক, বাংলা বক্তৃতা, বাংলা উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিটি বিষয়েই সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আর শুধু কি তাই। সর্বাধিক আইটেমে প্রথম হওয়ার সুবাদে আবার একটি বিশেষ পুরস্কার। দেখ কেমন পাতলা ছিপছিপে চেহারা, চোখে চশমা, মাথায় তুর্কী টুপি, শেরওয়ানী ও চৌস্ত পাজামা পরিহিত ছেলেটি। ডায়াস থেকে একটি বিষয়ে প্রথম হওয়ার জন্য তার নাম ঘোষিত হচ্ছে সেই পুরস্কার নিয়ে নিজ আসনে বসতে না বসতেই আবার তার নাম ঘোষিত হচ্ছে। সবকটি বিষয়ে প্রথম শুধুমাত্র আজকে যেন সেই ছেলেটির জন্যই উৎসর্গকৃত। ডায়াস-টু-নিজ চেয়ার বারংবার ওঠানামা করতে করতে সেই ছেলেটি খুবই কর্মক্লান্ত। অথচ বিজয়ের ভাস্বরজ্যোতি তার মুখে দেদীপ্যমান। ছেলেটি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। পারঙ্গমতা দেখে মনে হয়- এ নিয়েই বুঝি কাটে তার সারা দিনরাত। কিন্তু না

পড়ালেখাতেও সে সমানতালে কৃতিত্বপূর্ণ-মেট্রিকে সে সম্মিলিত মেধাতালিকায় ৫ম এবং আই, এ পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে। শুধু কি তাই, ইংরেজি অনার্সে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট আর মাস্টার্সেও ফার্স্টক্লাস। অতঃপর চল্লিশ বৎসর বয়সে একজন নামকরা কৃতিছাত্র হিসাবে তিনি ক্যামব্রীজ থেকে পি এইচ ডি করেন। নাহ! তোমাদের বোধ হয় আর তর সইছে না, কে এই ছেলেটি? তিনি হলেন সৈয়দ আলী আশরাফ। হ্যাঁ-হ্যাঁ তিনিই হলেন মরহুম ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি লেভেলের বিশ্ববিদ্যালয় দারুল ইহসানের প্রতিষ্ঠাতা ভিসি। ১৯৯৮ সালের ৭ আগস্ট যিনি এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন চিরদিনের তরে। তিনি এক রত্নাগর্ভা-মায়ের সন্তান, তারা পাঁচভাই পাঁচবোন ছিলেন। বড়ভাই অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান-জাতীয় অধ্যাপক ও সাবেক রাজশাহী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, মরহুম দ্বিতীয়, অধ্যাপক সৈয়দ আলী রেজা প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, অধ্যাপক সৈয়দ আলী নকী দারুল ইহসানের বর্তমান প্রোভিসি, সৈয়দ আলী তকী এক সময়ের বাংলার শিক্ষক। এসো আমরাও এই মহাপুরুষের মতো হওয়ার জন্য চেষ্টা করি।

ইন্টারনেট বদলে দিয়েছে পশ্চিমা কিশোরদের জীবনযাত্রা। বেজবল, বাস্কেটবল, টেনিস নিয়ে মেতে থাকা কিশোর কিশোরীরা এখন মেতে থাকছে কম্পিউটার নিয়ে যারা একটু সৃজনশীর তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওয়েবপেজ ডিজাইন, ওয়েব হোস্টিং নিয়ে। রিচার্স কম্পিউটার ইকোনমিক্স নামের একটি সংস্থা হিসাবে গোটা আমেরিকার প্রায় লক্ষাধিক কিশোর-কিশোরী এখন ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে কিছু না কিছু উপার্জন করছে। ইন্টারনেট থেকে আয় করে রীতিমত ধনকুব হওয়ার উদাহরণটা কিন্তু অন্যদিকে। ৮ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১০০ জন ইন্টারপ্রেনড়য়ার এর ওপর জরিপ চালিয়ে দেখেছে ইয়ং বিজ ম্যাগাজিন। শীর্ষস্থানীয় ৪ জন কিশোর উদ্যোক্তার গড় আয় প্রায় চার লক্ষ ৩৩ হাজার ডলার। এরা সবাই ইন্টারনেট থকে লাখপতি হয়েছে ই-কমার্স আর ওয়েব ডিজাইনের কাজ করে। অবশ্য লাখোপতিদের সবাই যে খুব ভেবেচিন্তে কাজ শুরু করেছে তা নয়। সামান্য মেধা, সামান্য আলাপ,

সামান্য অ্যাডভেঞ্চার থেকেই অনেক সময় অসামান্য ঘটনার নায়ক হয়ে গেছে তারা। অন্তত মাইকেল ফারডিকের ক্ষেত্রে তা অ্যাক্সিডেন্টই ছিল সমস্ত ঘটনার উৎস। ১৯৯৭ সালে সে সময় মাইকেল ফারডিকের বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। কানাডার টরেন্টোতে বাবা-মায়ের সাথে থাকতো সে। স্রেফ মজা করার জন্য বাড়ির গ্যারেজে বসে বসে একটি ওয়েব সাইড তৈরি করে সে।

ইন্টারনেট কিভাবে কাজ করে সে বিষয়ে কিছু লেখা আর ছবি ছিল সে সাইডে। এ সাইডেই একবার ভিজিট করতে আসে ১৬ বছরের অস্ট্রেলিয়ান কিশোর মাইকেল হেম্যান। চ্যাট রুম থেকে ধীরে ধীরে আলাপ জমে ওঠে পনেরো ষোল বছরের দুই সমমনা কিশোরের মধ্যে। এ আকস্মিক আলাপ থেকেই এক সময় বেরিয়ে আসে হেল্প সাইড তৈরির আইডিয়া।

১০০ ডলার খরচ করে মাই ডেস্কটপ ডট-কম নামের একটি ডোমেইন নেম কেনে ফারডিক আর হেম্যান মিলে। ওয়েব সাইটে দেয়ার জন্য উইন্ডোজ সংক্রাটপস, গেমস আর অন্য ইনফরমেশনগুলো নিজেরাই জোগাড় করে এখান-ওখান থেকে। ওয়েব সাইট হোষ্ট করার জন্য যে সার্ভার স্পেস দরকার তাও ম্যানেজ করা হয় একটি কোম্পানীর সঙ্গে কথা বলে। কোম্পানি বিনা পয়সায় তাদের ওয়েব সাইটের জন্য জায়গা করে দেবে, বিনিময়ে সাইটে দেখাতে হবে ওই কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। একমত হয়ে কাজ শুরু করে দেয় দুই কিশোর। তাদের চোখে তখন অ্যাডভেঞ্চারের নেশা।

অথচ বিস্ময়ের বিষয় হলো, পৃথিবীর দুইপ্রান্তের এ দুজন কিশোর কিন্তু এতো বড় একটা কাজের আগে সামনাসামনি একবার দেখাও করেনি। এমনকি টেলিফোনেও মাত্র দুই একবার কথা হয়েছে তাদের। ই-মেইলে তাদের পরিচয়, ই-মেইলে আলাপ, ই-মেইলেই সখ্যতা। আজ থেকে পাঁচ বছর আগেও এমন কিছুকারো ভাবনাতেই আসতো না। ১৯৯৮-তেই মাইডেস্টটপ ডট-কমে দর্শনার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায়ে মাসে ১০ হাজার। বুদ্ধি করে একটা অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করে তারা। ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপন দেখানো বাবদ মাসে আয় করতে থাকে হাজার

হাজার ডলার। মাইক্রোসফট উইনিজিপের মতো কোম্পানিও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গে। এ সময়ই কাজের সুবিধার জন্য অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে কানাডায় চলে আসে হেম্যান। কানাডায় আসার পর দুই কিশোর মিলে আরো বড়োসড়ো করে তোলে সাইটের কার্যক্রম। তাদের সাইটেক দর্শক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় মাসে ১০ লাখ। মাসিক উপার্জন হয়ে দাঁড়ায় ৩০ হাজার ডলার।

ইন্টারনেট ডট-কম নামের একটা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি থেকে এ সময় প্রস্তাব আসে মাইডেস্কটপ ডট-কম কিনে নেয়ার। অনেক আলাপ আলোচনার পর নিজেদের শখের কোম্পানিকে অন্যের হাতে তুলে দেয় ফারডিক-হেম্যান। বিনিময় মূল্যটা অবশ্য ঠিকই বুঝে নেয় তারা। প্রাথমিকভাবে দুজনের ভগে পড়ে ৪ মিলিয়ন ডলার করে। সঙ্গে ইন্টারনেট ডট-কম কোম্পানির কিছু শেয়ার। কোম্পানির লাভ যতো বাড়বে, সারা জীবন ধরে তার একটা লভ্যাংশ পেতেই থাকবে এ দুই কিশোর।

চড়া দামে মাইডেস্কটপ ডট-কম বিক্রির পরে স্বাভাবিকভাবেই মিডিয়ার কাছে হট আইটেমে পরিণত হয় ফারডিক হেম্যান। নিজেদের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় পয়সার বিনিময়ে লেকচার দিতে শুরু করে তারা। সঙ্গে যোগ দেয় ফারডিকের গার্লফ্রেন্ড ক্যারেইরো। মেয়েদেরকে কি করে আরো প্রযুক্তিমুখী করা যায় সে বিষয়ে কাজ করতো ক্যারোইরো। এভাবেই এক সময় মাইক্রোসফটের এক কর্তাব্যক্তির নজরে পড়ে যায় তারা। ফারডিক আর ক্যারোইরোর চাকুরির ব্যবস্থা করা হয় মাইক্রোসফটে। কিশোর-কিশোরীরা কি ধরনের সফটওয়্যার পছন্দ করে, কি ধরনের গেমস খেলে, কোন ধরনের ওয়েব সাইটে ভিজিট করতে বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে সেবিষয়ে নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি মাইক্রোসফটকে জানানো হবে তাদের কাজ। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী মাইক্রোসফট তাদের পরবর্তী সফটওয়্যার গেমস বা ওয়েব সার্ভিসগুলোকে আরো আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে তুলবে।

তবে মাইক্রোসফটের চাকরি নিয়েই কিন্তু শুধু মেতে নেই ফারডিক। বাইবাডি ডট-কম নামের আরেকটা ওয়েব সাইট খুলেছে সে। আলাদা

একটা অফিস ভাড়া করেছে। ২০ জন কর্মচারি এখন কাজ করছে ১৮ বছর বয়সী এই কিশোরের কোম্পানীতে। সবচেয়ে মজার হলো, ছেলের প্রজেক্টে অংশ নেয়ার জন্য এনসিআর কোম্পানি ম্যানেজিং পার্টনারের কাজ ছেড়ে বাইবাডি ডট-কমের প্রধান নির্বাহী হিসাবে যোগ দিয়েছেন ৪৫ বছর বয়সী মাইকেলের বাবা।

তরপরও সবচেয়ে দামি হলো পড়াশোনা

ইন্টারনেটের কল্যাণে পশ্চিমের কিশোরদের অনেকেই আজ বাড়ি-গাড়ি-অফিসের মালিক। রাতভর কম্পিউটারের সামনে বসে থেকে অত্যন্ত চড়া দামে নিজেদের এই অসময়ের সাফল্য কিনছে তারা। অধিকাংশই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে। দুই একজন তো ঘোষণাই করে দিয়েছে, পড়াশোনা শেষ করার কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই।

তবে এদের মধ্যেও কয়েকজন আছে আত্ম উপলব্ধি ছুঁয়েছে যাদের। হার্ভাডে পড়ার সময় চিপলট ডট-কম তৈরি করেছিল ২৩ বছরের অমর গোয়েল। চিপলট থেকে মিলিয়ন ডলার এসেছে তার পকেটে। কিন্তু হার্ভাডের গ্রাজুয়েশন নেয়া হয়নি তার। তাই তো বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সুযোগ পেলেই পড়াশোনা শেষ করার কথা বলে অমর। এবং বলে পড়াশোনা শেষ করে তারপর ইন্টারনেট ব্যবসায়ে ঢোকার কথা।

লাখপতি মাইকেল ফারডিকেরও সেই একই মত। হয়তো ১৮ বছর বয়সেই তার একাউন্টে আছে কাড়িকাড়ি টাকা, আছে মাইক্রোসফটের চাবি, ঝকঝকে অফিস। তারপর শিগগিরই গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার জন্য স্কুলে ফিরে যাবে সে। এর কারণ অবশ্য তার বাবার উপদেশ। তিনিই বোঝাতে পেরেছেন ফারডিককে, যতো কিছুই থাকুক তোমার সবচেয়ে দামি হলো পড়াশোনা।

ঢাকার বনশ্রী আইডিয়াল স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ১১ বছরের অমিত। অমিত খুব মেধাবী, প্রাণবন্ত আর সিরিয়াস আত্মবিশ্বাসী। ১১ মাস সে শুয়ে রয়েছে হাসপাতালে দুরারোগ্য ওয়াইল্ড মোলিও রোগে। তার বাবা জানিয়েছে এ সময়ে তার হাত-পা কার্যক্রম ছিল না। তার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থা করতে হচ্ছে যান্ত্রিক উপায়ে। এ অবস্থাতেও সে

হাসপাতালের বেডে শুয়ে পড়া শেষ করেছে অনেক বই, পত্র-পত্রিকা। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছেলে সে। স্বাধীন ও স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য দরকার তার কৃত্রিম পেস মেকার। যা আমেরিকা থেকে আনতে হবে, দাম তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা। বাবার অসঙ্গতির কথা বুঝতে পেরে বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলে ঢাকা শহরে এত লোক, সবাই একটি করে টাকা দিলেই তো হয়ে যায়। মিডিয়ার বদৌলতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এ খবর গত অক্টোবর পর্যন্ত ৮০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হয়েছে। তোমাদের মত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা, সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, এমনকি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেকার পর্যন্তও তাকে ৬ শত টাকা দিয়েছেন। তার ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষা হলো-আত্মবিশ্বাস কিভাবে বিশ্বজয় করা যায়। আর মানবিক কারণে কিভাবে এগিয়ে যেতে হয়। আমরা অমিতের মতো অমিত আত্মবিশ্বাসী হতে চাই।

কালের শপথ, মানুষ মূলতঃই বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত;
সেই লোকদের ছাড়া, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে
এবং একজন অপরজনকে হক উপদেশ দিয়াছে ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিয়াছে।

- সূরা আল আসর

স্বপ্ন ঃ

তোমরা যদি সত্যিই সুন্দর ক্যারিয়ার গঠন করতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাদের স্বপ্ন দেখা শিখতে হবে। স্বপ্নের কথা শুনে তোমরা ভয় পেয়ে গেলে কি? স্যরি তোমরাতো সে রকমটি অর্থাৎ ভীতুর ডিম নও। আর আমিও কিন্তু তোমাদেরকে সেই ভূত-প্রেতের স্বপ্নের কথা বলিনি। এবার আসা যাক আসল কথায়। এ স্বপ্ন হচ্ছে বড় হওয়ার স্বপ্ন। অনেক অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন। আর নিজের ওপর সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের চমৎকার সব কথা। চলো কিছু উদাহরণ জেনে নিই ঃ

এক. হাজার বছর ধরে দৌড়বিদরা ৪ মিনিটে এক মাইল দৌড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এটা অসম্ভব। দৈহিক গঠনের কারণেই তা মানুষের পক্ষে কশ্মিনকালেও সম্ভব নয় মানুষের হাড়ের কাঠামোও ফুসফুসের গঠন দুটোই এ সাফল্যের পথে অন্তরায় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন। দু'হাজার বছর পার হয়ে গেল এভাবেই। তারপরই এল এক শুভদিন। একজন মানুষ প্রমাণ করলেন যে, বিশেষজ্ঞদের এ ধারণা ভুল তারপর ঘটল আরো অলৌকিক ঘটনা। রজার ব্যানিস্টার প্রথম ৪ মিনিটে এক মাইল দৌড়ের রেকর্ড স্থাপন করার ৬ সপ্তাহের মধ্যেই জন ল্যান্ডি পুরো ২ সেকেন্ডের ব্যবধানে ব্যানিস্টারের রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। আর তারপর এ পর্যন্ত হাজারের বেশি দৌড়বিদ ৪ মিনিটের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। যখন অসম্ভব মনে করা হতো, তখন কেউই পারেননি । আর একবার করা সম্ভব বিশ্বাস করার পর রেকর্ড ভাঙ্গার হিড়িক পড়ে যায়।

দুই. বিজ্ঞানী টমাস এডিসন বিশ্বাস করতেন যে, তিনি একটি সঠিক বৈদ্যুতিক বাতি তৈরি করতে পারবেন। এই বিশ্বাসই তাকে গবেষণার ক্ষেত্রে দশহাজার বার ব্যর্থতার পরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি সক্ষম হয়েছিলেন সঠিক ধাতু প্রয়োগ করে যথার্থ বৈদ্যুতিক বাতি নির্মাণ করতে। বিমান আবিষ্কারক রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বিজ্ঞানী জগদিশ চন্দ্র বসুসহ অসংখ্য বিজ্ঞানীর সাফল্য তাদের আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের ফলেই অর্জিত হয়েছে।

তিন. নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইরিশ নাট্যকার জর্জ বানার্ডশ মাত্র ৫ বছর স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। দারিদ্রতার কারণে মাত্র ১৫ বছর বয়সে মাসে আমাদের টাকায় ৪০ টাকা বেতনে কেরানীর কাজ নেন। কিন্তু তিনি লেখক হতে চেয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন একদিন তিনি একজন বড় লেখক হবেন। এমনকি সেক্সপিয়ারকেও তিনি অতিক্রম করবেন। তাই তিনি প্রতিদিন নিয়মিত লেখাপড়া শুরু করেন। বাধ্যতামূলকভবে প্রতিদিন ১০ পৃষ্ঠা, কোনদিন না পারলে পরের দিন বিশ পৃষ্ঠা। লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে তার ৯ বছর সময় লেগেছিল। লেখক জীবনের প্রথম ৯ বছর তার লেখা থেকে আয় হয়েছিল আমাদের টাকার হিসেবে মাত্র ৩০০ টাকা। কিন্তু তার বিশ্বাসই তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। লেখক হিসেবেই পরবর্তী জীবনে উপার্জন করেছেন লাখ লাখ টাকা। তার চাইতেও বড় কথা বিশ্বব্যাপী শাশ্বতকালের খ্যাতি তার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার।

চার. মার্কিন ধনকুবের এন্ড্রু কার্নেগীর কথাই ধর। তিনি তার সময়ের সবচেয়ে বড় ধনকুবের ছিলেন। শুধু কি তাই তার প্রেরণায় আমেরিকাতে হাজার হাজার বিলোনিয়ার তৈরি হয়েছে। কিন্তু এক সময় তিনি ছিলেন বস্তির ছেলে। ১২ বছর যখন তার বয়স, তার পোশাক এত মলিন ও নোংরা ছিল যে, দারোয়ান তাকে পাবলিক পার্কে প্রবেশ করতে দেয়নি। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে একদিন তার টাকা হবে সেদিন তিনি এই পার্কটি কিনে ফেলবেন। তিনি সে পার্কটি কিনেছিলেন। পার্কে নতুন একটি সাইনবোর্ড লাগিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, আজ থেকে দিনে বা রাতে যে কোন সময়ে যে কোন মানুষ যে কোন পোশাকে এই পার্কে প্রবেশ করতে পারবে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার সকল সম্পদ জনহিতকর কাজে দান করে যান।

পাঁচ. মনের শক্তি দিয়ে মানুষ যে রোগ ও দৈহিক পঙ্গুত্বকেও অস্বীকার করতে পারে তার প্রমাণ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। লিখতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না, দুরারোগ্য মোটর নিউরোন ব্যাধিতে ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হওয়ার পথে এগিয়ে যেতেও তিনি বিশেষভাবে তৈরি কম্পিউটারের

সহযোগিতায় রচনা করেছেন বর্তমান যুগের বিজ্ঞান জগতের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'এ ব্রীফ হিস্ট্রি অব টাইম'। যেটি বেষ্ট সেলারের আখ্যা পেয়েছে ইতোমধ্যেই বিক্রি হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ কপি। হুইল চেয়ার থেকে তুলে যাকে বিছানায় নিতে হয়, তিনি অবলীলায় মহাবিশ্ব পরিভ্রমণ করে উপহার দিয়েছেন বিশ্ব সৃষ্টির নতুন তত্ত্ব। আইনস্টাইনের পর তাকেই মনে করা হচ্ছে বিশ্বের প্রধান বিজ্ঞানী।

ছয়. কাফেরদের অত্যাচারে তখন মুসলমানেরা পবিত্র কাবার পাশেও দাঁড়াতে পারে না। এত অত্যাচার আর কতদিন সহ্য করা যায়। রাসূল (সা) কে গিয়ে এক সাহাবী কাতর কণ্ঠে বললেন "আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে।" বিশ্বাসে বলীয়ান রাসূল (সা) রাগম্বিত হয়ে গেলেন অনেক কথার পর বললেন অবশ্যই ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে এবং তখন সমগ্র আরব ভূভাগে মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার মতো কেউ থাকবে না। মাত্র পনের বছর পরেই তার ইন্তেকালের সময় তার ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন হয়েছিল প্রায় ত্রিশলক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

নিউরো সাইন্টিস্টরা বলেন, মানব মস্তিষ্ক সর্বাধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও কমপক্ষে দশ লক্ষ গুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই দামের হিসেব করলে একটি কম্পিউটারের দাম যদি ৫০ হাজার টাকা হয় তাহলে আমাদের একেকজনের ব্রেনের দাম দাঁড়াচ্ছে কমপক্ষে ৫,০০০ কোটি টাকা। আমরা সব সময় কমপক্ষে পাঁচহাজার কোটি টাকার মূল্যের সম্পদ নিজ ঘাড়ের উপরই বয়ে বেড়াচ্ছি। এরপরও যদি আমি তুমি গরিব থাকি তাহলে আমাদের দারিদ্র্যের কারণ অভাব নয়, স্বভাব। কারণ আমরা ব্রেনের মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ ক্ষমতার ব্যবহার করছি। আর প্রতিভাবানরা- সফল ব্যক্তিরা এই ব্রেনের ক্ষমতার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ব্যবহার করছেন। তুমিও যদি ব্রেনের এই ক্ষমতাকে এদের মত ব্যবহার করতে পারো তাহলে নিঃসন্দেহে সফল ও খ্যাতিমান হতে পারবে। তাহলে চলোই না আজ থেকেই লেগে পড়ি।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। আমিন।